থিয়েটার

মনোজ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৬২

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী : রবীন দত্ত

মুদ্রক : অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ডক্টর শ্রীমান দীপক চন্দ্র
পরম প্রীতিভাজনেষু

॥ এক ॥

রুবি থিয়েটার—একমাত্র স্বত্বাধিকারী মণিস্থন্দর চৌধুরি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক, সেই মণিসুন্দর। সে যুগের যা দস্তুর—বোমা-রিভলভারের দলে ছিলেন তিনি, বক্তৃতায় আগুন বইয়ে দিতেন। ফলে জেলের ঘানি ঘোরাতে হত যখন তখন, একবার কালাপানি পাড়িও দিয়েছিলেন। বয়সে রোগ আরোগ্য হয়ে গিয়ে থিয়েটার ফাঁদলেন। 'ছি-ছি'র আর অন্ত রইল না: এমন একটা মানুষের পরিণাম হল কিনা বাজারের নটী নাচিয়ে দিন-গুজরান! মণিসুন্দরের কান অবধি কিছু কিছু পৌঁছে যেত। হাসতেন তিনি: বুঝলে না—কবিরাজি অনুপানে অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে—মধু অভাবে গুড়। আমাদেরও সেই জিনিস। তারক বাড়ুয্যে ছিল যত অ্যাকশনের পাণ্ডা, এখন সে মাংসের দোকান করেছে। বলে, ইংরেজের বদলে এখন পাঁঠা-খাসির ঘাড়ে কোপ বসাই। আর আমার ছিল গলাবাজির কাজ, এখন ইংরেজ-রাজার বদলে মথুরার রাজা কংসের উপরে গালি ঝাড়ি। নিজের গলায় জোর নেই তো তারামণি পুলোমা সেজে সেই কাজটা করে দেয়।

মণিসুন্দরের নিন্দে হোক যা-ই হোক, রুবি থিয়েটারের নাটক লোকে কিন্তু খুব নিত। নতুন নাটক খুললেই হাউস-ফুল। বেশির ভাগ পৌরাণিক। অথবা ঐতিহাসিক। ঘটনা হুবহু পুরাণে বা ইতিহাসে রয়েছে, তবু যেন ভিতরে ভিতরে নতুন জিনিস আরও কী-সব। ঝানু দর্শক ভক্তি-বিশ্বাসে গদ-গদ হত না, নাটকীয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের মিল খুঁজত। তর্ক ঘোরতর: একজন বলে, নাটকের অর্জুন আসলে কানাই দত্ত, অন্যে বলে, না, বাঘা-যতীন। কংসের কারাগার বলে দেখাচ্ছে—দেউলি-ক্যাম্প। ওর মধ্যে কৃষ্ণের জন্ম। ভাদ্র মাসের ঘোরা নিশীথিনী। উদ্দাম ঝড়, অবিরল বৃষ্টি, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক বজ্রগর্জন। সুকোমল রাজশয্যায়

ঘুমন্ত কংস—স্বপ্ন দেখে সহসা তাঁর আরামের ঘুম ভেঙে যায়। আর্তনাদ করে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। নেপথ্য কণ্ঠ: পরিণাম ঘনিয়ে আসছে অত্যাচারী রাজা। যে তোমায় শেষ করবে তোমারই বন্দীশালার সতর্ক প্রহরার মধ্যে এইমাত্র সে জন্ম নিল।

নাটকের নাম 'বন্দীশালা'। পৌরাণিক অবশ্যই। তারামণি পুলোমা সাজত। পুলোমা পুরাণে নেই, সম্পূর্ণ কল্পনায় বানানো দেবকীর কিঙ্করী—কংসের বন্দিনীদের মধ্যে সে-ও একটি। তারামণির মতন অতবড় অভিনেত্রীকে দিয়েছে দেবকী নয় কংসের পাটরাণী নয়, সামান্য চাকরাণীর পাঠ। দুর্দান্ত নির্ভীক ক্ষুরধার-রসনা। 'সাবধান, সাবধান, যত রক্ত ঝরায়েছ এই বারে প্রতিদান—' 'মুকুটহীন ছিন্নমুণ্ড—চিনি হে তবু চিনি, এই পরিণাম দেখব বলে মরেও তো মরি নি'—পুলোমার গানের এই সমস্ত লাইন লোকের মুখে মুখে। কংসের উদ্দেশ্যে হলেও ভিতরের মানেটা সরকার বোঝে না, এমন নয়। কিন্তু বেশ খানিকটা ফাঁপরে পড়েছে। তড়িঘড়ি কিছু নয়, ধীরে-সুস্থে বিচার-বিবেচনা করে এগোতে হবে। কেন না ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাপার—ধর্মের উপর আঘাত সন্দেহ হলে ধর্মপ্রাণ জাতি ক্ষেপে যেতে পারে। সিপাহি-মিউটিনির অভিজ্ঞতা রয়েছে কর্তাদের।

পুলোমার কয়েকটা গান গণেন গুপ্তর। মণিসুন্দরের বন্ধুলোক তিনি, খাতিরে দিয়েছেন। কিন্তু কানাঘুসোই শুধু, হাতে-নাতে প্রমাণ নেই। গান টুকে নিয়ে মূল-পাণ্ডুলিপি সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ফেলে দেয়। রিহার্শালেও কোন দিন গুপ্তমশায়কে দেখা যায় নি—থিয়েটার-বাড়িতেই তিনি তখন পা ছোঁয়াতেন না। স্বদেশি-যাত্রার অনেক গানই তাঁর—সেখানেও ঠিক এই রকম বন্দোবস্ত। ফলে অধিকারীর হয়তো জেল, গণেন গুপ্তর ধরা-ছোঁওয়া পায় না। অধিকারী খুশি: আমি গেলে নতুন অধিকারী মিলবে, গুপ্তমশায় জেলে গিয়ে বসে থাকলে আগুনে আর জোর থাকবে না। পুলিশের

লোকও তাঁকে ভালবাসে—দৈবে সৈবে যদিই-বা সুলুকসন্ধান কিছু কানে আসে, তারা চেপে যায়—উচ্চবাচ্য করে না।

পুলোমার গানের রেওয়াজ থিয়েটারে নয়—তারামণির বস্তি-বাড়িতে। রাত দুপুরে গণেন গুপ্ত চলে যান সেইখানে। কারো কোন সন্দেহ জাগে না—ও-পাড়ায় ঐ সময়টা ঘরে ঘরে গান।

কিন্তু তারামণি গোলমাল করছে। গান নিয়ে তার ঘোর আতঙ্ক। গণেনের কাছে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে: ফষ্টিনষ্টি গান গাই, তা বলে এই আগুন? সৎলোক কাউকে গিয়ে গাওয়ান বাবা, আমার মুখে ও-জিনিস বেরুবে না। লোকে থুতু দেবে।

গণেন গুপ্ত ধমক দিয়ে উঠলেন: কী বেরুবে না-বেরুবে, আমার চেয়ে বেশি বুঝিস তুই? পাকামি করবি নে—যেমন যেমন দেখাচ্ছি, গেয়ে যা।

গেয়ে যেতে হয় অতএব। দু-চার পদ গেয়ে তারামণি হাপুস নয়নে কেঁদে ওঠে। তখন আবার মিষ্টি কথা: এই রেঃ, পাগলি ক্ষেপে গেছে। আচ্ছা, গাইতে হবে না তোকে। আমি গাইছি, তুই কেবল ঠোঁট মিলিয়ে যা।

পরের দিন গণেন গুপ্ত ভীমনাগের সন্দেশ হাতে করে এসেছেন। বলেন, মিষ্টি খেয়ে নে—ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি নয়, মিষ্টিকথা বেরুবে। কথাই তো হয়ে গেছে—উইংসের আড়াল থেকে আমি গাইব, স্টেজের উপর তুই কেবল ঠোঁট নেড়ে যাবি।

শেষ পর্যন্ত গাইল কিন্তু তারামণিই। সজ্ঞানে গায়নি—তারামণি দিব্যি করে বলে, গণেন গুপ্ত যেন কণ্ঠে ভর করেছিলেন, সম্মোহিত অবস্থায় গেয়ে শেষ করল। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—তুমুল বন্দেমাতরম্-ধ্বনি। পর্দা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। তারামণি গ্রীনরুমে গেল না, যাওয়ার তাড়াও নেই, স্টেজের উপর ঐখানে ঢলে পড়ল। নাটক পৌরাণিক, দ্বাপর যুগের কথা, কংসের

কারাভ্যন্তর দৃশ্য—তার মধ্যে বন্দেমাতরম্ কেন? থামে না সে ধ্বনি, অডিটোরিয়াম ফেটে চৌচির হয়ে যায় বুঝি!

প্রথম রাত্রে গণেন গুপ্ত আজ উইংসের পাশে, এবং প্রোপ্রাইটর মণিসুন্দর অডিটোরিয়ামে সকলের পিছন দেয়াল ঠেঁশ দিয়ে দাঁড়িয়ে। দুজনেই ছুটে এসে পড়লেন। গণেন গুপ্ত এসেই তো তারামণির গালে ঠাস-ঠাস করে চড়। বলেন, কী আস্পর্ধা ছুঁড়ির—বলে কিনা, গান শুনে লোকে থুতু দেবে। থুতু না কি দিচ্ছে শুনতে পাস? আর, মার খেতে খেতে তারামণি ওদিকে উঠে বসে বারবার গড় করছে গণেন গুপ্তর পায়ে।

মণিসুন্দর বলছেন, চলবে না। এ যা হয়েছে, পরমায়ু তিন-চার রাত্রের বেশি নয়। আর্টিস্ট কেউ তোমরা চলে যেও না। দরকারে সারা রাত্তির থাকতে হবে। থিয়েটারেই খাবার আনিয়ে দেবো।

ম্যানেজার ব্যাখ্যা করে দেয়: চলবে না মানে হল পুলিশে চলতে দেবে না। পয়লা অভিনয় আজ, পাঠ মুখস্থ হয় নি ভাল করে, স্টেজে চলাচল রপ্ত নয়—তাতেই লোকের এই রকম মাতামাতি। বই বন্ধ করার নোটিশ এলো বলে।

তারামণি চড়চাপাটি খেয়ে কাঁদে নি, এইবারে কেঁদে ভাসাল। মণিসুন্দরকে জোড়হাত করে বলে, আমার পাঠের একটা কথাও যদি কাটা পড়ে, সে আমার হাত-পা কাটার শামিল হবে বাবা।

কাট-ছাঁট অনেক হল ডায়ালোগের উপর। গানেরও লাইন বাদ গেল, কিছু কিছু কথা পালটাল। পোস্টারেও কেবল বুড়োবুড়ি ও ধার্মিকদের আকর্ষণের চেষ্টা:

> পৌরাণিক নাটক। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের পুণ্যকথা, পরিণামে কংসের নিধন। পাপের ক্ষয়, ধর্মের জয়। ধর্মপ্রাণ নরনারী দলে দলে আসুন—

নাটকের যথাসম্ভব রদ-বদল এবং চেষ্টা-তদ্বির সত্ত্বেও মাস ছয়েক হতে না হতেই অভিনয় বন্ধ, 'বন্দীশালা' বাজেয়াপ্ত।

ঐতিহাসিক নাটকও অনেক হয়েছে। যথা—'ছত্রপতি শিবাজী'। তারামণি জিজাবাই সেজে বলত, দেশের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে আমি যে গর্ভধারিণী মা, আমারও মুণ্ডপাতে দ্বিধা কোর না বৎস শিবাজী। 'রাজপুত-বীর' নাটকে ঐ তারামণিই যশোবন্ত-মহিষী সেজে বলত, আমার স্বামী নও—তুমি প্রবঞ্চক। আমার স্বামী শত্রুর দিকে পিঠ ফেরায় না—বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, সম্মুখরণে প্রাণ দেয়।

এমনি সব পাঠ তারামণির। পুলিশ এসে ভয় দেখায়: অ্যাক্টিং তো নয়—আগুনের ফুলকি। রাজদ্রোহ ছড়াচ্ছ, ধরে তোমায় জেলে পোরা হবে।

নিতান্ত ন্যাকাবোকা তারামণি। বলল, মুখ্যু মেয়েমানুষ হুজুর, বইয়ের কথা মুখস্থ বলি। যেমন ধারা শিখিয়ে দেয়, তোতাপাখির মতন তেমনি আউড়ে যাই। ছাইভস্ম কি বলে এলাম, অর্ধেক কথার মানেই তো বুঝতে পারিনে—

মণিসুন্দরকে পুলিশে জিজ্ঞাসা করে: আপনার এখানে বেছে বেছে কেবল এমনি সব নাটক কেন হয়?

মণিসুন্দর জল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন: এক এক থিয়েটারের এক-রকমের নাম পড়ে যায়। সামাজিক নাটকে জুবিলি থিয়েটার। নবরঙ্গে যায় হালকা নাচগান রংতামাশা যাদের পছন্দ—

ম্যানেজার পাশ থেকে ফোড়ন কেটে ওঠে: আদিরসের বোঁটকা গন্ধ যার মধ্যে।

মণিশঙ্কর প্রশ্রয়ের সুরে তাড়া দিয়ে উঠলেন: আঃ, ওসব কেন আবার?

ম্যানেজার বলে, সোজাসুজি বলে ফেললাম। চোখ বুঁজে থাকলে কি হয়, সারেরাও না জানেন কোনটা?

মণিসুন্দর পূর্বকথার জের ধরে বলে যাচ্ছেন, আমরাও তেমনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিকে কিছু নাম করেছি। শিবের জটা থেকে

গঙ্গা বেরুনো, বসুদেবের মাথায় ছাতার মতন বাসুকীর ফণা মেলে ধরা—রকমারি সিনসিনারি, নন্দনকানন, মোতিমহল শিশমহল, নবাব-বাদশা বেগম-বাঁদী এই সমস্ত দেখতে লোকে আসে এখানে। দেখে হাসিখুশিতে ফিরে যায়।

ছেঁদো কথায় পুলিশ-অফিসার ভোলে না, ঘাড় নাড়েঃ শুধু এইটুকু নয় মশায়, সাজগোজ আর গঙ্গাবতরণের চমক ছাড়াও ভিতরে ভিতরে শয়তানি খেল আছে। জীবনভোর বিস্তর খোয়াব হয়েছে, এখন এই শেষ বয়সে আবার কোনও ঝঞ্ঝাটে না পড়েন!

মণিসুন্দর নিরীহভাবে বলেন, ঝঞ্ঝাটে পড়ব না বলেই তো ভেবে-চিন্তে এই লাইনে আসা। বাজারের নচ্ছার নোংরা মেয়েমানুষ নিয়ে আমাদের কাজকারবার—পুণ্যবানেরা তো থিয়েটার-বাড়ির পথটা পর্যন্ত কাউকে দেখাতে নারাজ। আবর্জনা-আঁস্তাকুড় বলে হ্যাক-থু করেন তাঁরা। আপনাদের কিন্তু সার ঘেন্না নেই—হয়তো-বা আমারই নামের গুণে। যেদিন যমালয়ে যাব, পিছন পিছন সেই অবধি আপনারাও চর পাঠাবেন, বুঝতে পারছি—

ছি-ছি, ভুল ধারণা।—অফিসার প্রবল বেগে ঘাড় নাড়লঃ আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমরা। ভ্রান্ত পথ বটে, তাহলেও দেশের মঙ্গল ভেবেই সারাজীবন আপনি কষ্ট করেছেন। নতুন ব্যবসায় নেমেছেন, সোজাসুজি তাই নিয়ে থাকুন—যে ক'টা দিন পরমায়ু আছে, সুখশান্তিতে কেটে যাক। কথা দিচ্ছি, কখনো পুলিশ উৎপাত করতে যাবে না। দরকারে বরঞ্চ সাহায্যই পাবেন।

মৃদু হেসে মণিসুন্দর বললেন, বটে!

ম্যানেজার বলে, সোজাসুজি ব্যবসা কাকে বলছেন সার, বুঝতে পারলাম না।

অফিসার বলল, নবরঙ্গ করছে জুবিলি করছে—আপনারাও তেমনি করুন। তাদের কোন হাঙ্গামা নেই, আপনাদেরই বা কেন হবে?

মুখফোঁড় ম্যানেজার বলে উঠল, মোটা সরকারি মাসোয়ারাও পায় নাকি, নবরঙ্গের নামে বাজারে গুজব।

বাজে কথা, সরকারের টাকা সস্তা নয়। পুলিশ-অফিসার উড়িয়ে ছিল একেবারে। ঈষৎ ইতস্তত করে বলে, তবে মণিবাবুর কথা আলাদা। সারাজীবন নানান শাস্তি-ভোগ হয়েছে, এখন যাতে আরামে থাকতে পারেন, সকলেরই সেটা দেখা উচিত। আমি বলি, নবরঙ্গের মতো আপনারাও নির্ঝঞ্ঝাটের পথ ধরুন। সুপথে ফিরেছেন বুঝলে সরকারের সর্বরকম সহযোগিতা পাবেন।

মণিসুন্দরের একমাত্র ছেলে সত্যসুন্দর তখন বয়সে যুবা। বাপের থিয়েটারে আসেন যান, অল্পসল্প শিক্ষনবিশি করেন। অফিসার বিদায় হয়ে গেলে একগাল হেসে বাপকে বললেন, তোমাকেও শোধরাতে চায় বাবা।

মণিসুন্দর বললেন, পারলে তো ভালই হত। থিয়েটার নিয়ে ঝামেলা থাকত না। হল খা-খা করুক যাই হোক, তাকিয়েও দেখতাম না। নাটকের ক্ষমতা ওরা জানে। চাক্ষুষ আবেদন—চোখের সামনে ঘটে, বুকের পরতে পরতে বসে যায়। ছাপা বই কিম্বা মুখের বক্তৃতা এর ধারে-কাছেও দাঁড়াতে পারে না। খবর আছে, আই-সি-এস'কে মাথায় বসিয়ে এর জন্য আলাদা এক গুপ্ত ডিপার্টমেণ্ট হয়েছে। তা-বড় তা-বড় লেখক দিয়ে তারা ফরমায়েস মতন মাল বানায়, 'আর্টস ফর আর্টস সেক' বুলি কপচে লেখক পকেট-ভরত্তি টাকা নিয়ে নেয়। ছাপা হয়ে সেই সমস্ত ছেলে-বুড়োর হাতে হাতে ঘোরে, নাটক হয় সেই মালে, সিনেমা-ছবি হয়। মানুষ আয়েসি ইন্দ্রিয়পর অপদার্থ খয়ের-খাঁ হয়ে গেলে স্বদেশিরা আর তখন পাত্তা পাবে না, জেল-ফাঁস না দিয়েও নির্গোলে তারা নিশ্চিহ্ন হবে। সরকার হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

পুলিশ বুঝল, এ বড় শক্ত ঠাঁই। নবরঙ্গ থিয়েটার এবং আর বিশ-পঞ্চাশটা ক্ষেত্রে (নাম জেনে কাজ নেই, স্তম্ভিত হবেন।

দেশহিতৈষী বলে জেনে বসে আছেন, তাই থাকুন না।) যা হয়েছে, রুবি থিয়েটারে তা কোনক্রমে সম্ভব হবে না। অতএব আদা-জল খেয়ে লাগল তারা। জরিমানা কত বার যে হল, গোণাগণতি নেই। মণিসুন্দর সঙ্গে সঙ্গে টাকা জমা দিয়েছেন। বিস্তর খাটাখাটনি ও খরচখরচা করে নতুন বই খুললেন, পাঁচ-সাত রাত্রি হতে না হতে সে বই বন্ধ করে দিল। এমন অনেকবার হয়েছে। এত খেসারৎ দেবার পরেও লোকসান নেই, রুবি বরঞ্চ কেঁপে উঠছে। লোকে যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। রুবি থিয়েটারে নতুন বই খুলেছে—বাজারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়ঃ তাড়াতাড়ি দেখে আসি চল—পুলিসে কবে আবার বন্ধ করে দেবে! কাউন্টারে খদ্দের সামলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার—টিকিট বিক্রি দেখতে দেখতে শেষ। 'হাউস-ফুল' বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। নাছোড়বান্দা দু-একজন তবু কাকুতি-মিনতি করে, বাড়তি চেয়ার দিয়ে কোনরকমে একটু জায়গা করে দিন। কিংবা, না-ই বা দিলেন চেয়ার—টিকিট দিন, দাঁড়িয়ে দেখব।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশি-যাত্রা—পাশাপাশি রুবি থিয়েটারের নাম। জুবিলি হিংসায় বাঁচে না। বলে, পুলিসের কারসাজি। মণিসুন্দরবাবু ওদের মোটারকম খাওয়ান। রুবিতে কি বলল না বলল—শুঁক-শুঁক করে পুলিসে গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, আমরা স্টেজে ঝড় বইয়ে দিলেও ফিরে তাকাবে না। আমাদের হলে তাই ছুঁচোয় ডন কষে, আর ওরা এক্সট্রা-চেয়ার দিয়ে দিয়ে কূল পাচ্ছে না।

পুলিসের বিষনজর—আবার প্রাজ্ঞ পণ্ডিতজনেরাও কালে-ভদ্রে দেখতে গিয়ে নিন্দেমন্দ করেনঃ পৌরাণিক নাটক ঐতিহাসিক নাটক বলে বিজ্ঞাপন ছড়ায়—আসলে দশটা বিশটা পুরাণ-ইতিহাসের নাম ও ঘটনার ছায়া, বাকি সমস্ত কল্পনার খেলা। তখন 'বঙ্গকেশরী' নাটক অন্য সব থিয়েটার কানা করে দিয়ে সাংঘাতিক রকম চলছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। বাঘা ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ সরকার

এলেন একদিন। ড্রপ পড়তেই ফুঁসতে ফুঁসতে তিনি গ্রীনরুমে ঢুকলেন। 'আসুন' 'আসুন' করে উঠে দাঁড়াল সকলে। চা আনতে ছুটল।

গোঁফজোড়া টেনে খুলে প্রতাপাদিত্য এসে শুধাল: কেমন লাগল?

রাবিশ! নাট্যকারের ঠিকানাটা দিন, তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

নাট্যকার সেদিন থিয়েটারেই ছিলেন। উপরের অফিসঘরে। খবর পেয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়ালেন।

অনিরুদ্ধ বলেন, প্রতাপাদিত্যের এই ইতিহাস কোথায় পেলেন আপনি?

রামরাম বসুর বইয়ে যেটুকু পাওয়া যায়। বাকি সব দরকার মতন বানিয়ে নিতে হল।

প্রতাপাদিত্যের মা মহারাণী সৌদামিনী?

ওটা সম্পূর্ণ বানানো।

অনিরুদ্ধ বলেন, নাটকের সেরা চরিত্র বলতে গেলে ঐ। আগাগোড়া সেটি কল্পনার জীব?

নাট্যকার বলেন, সেরা-অ্যাকট্রেস তারামণি—থিয়েটারের ভিড় তাঁরই জন্যে। ঠিক মতন তাঁকে খাটিয়ে নিতে হবে, তেজস্বিনী মা তাই একটা দরকার হয়ে পড়ল। মণিবাবু মুখে মুখে বলে গেলেন, ডায়ালোগগুলো আমি সিনে সিনে খাপ খাইয়ে বসিয়েছি।

আরে সর্বনাশ!—অনিরুদ্ধ শিউরে উঠলেন: এই জিনিস আপনারা ঐতিহাসিক নাটক বলে ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছেন!

স্বত্বাধিকারী মণিসুন্দর কোন দিকে ছিলেন, এমনি সময় এসে পড়লেন: কি বলছেন সার?

বানানো গল্প আপনারা ইতিহাস বলে চালাচ্ছেন। কাজটা ক্রিমিনাল—তা জানেন?

হো-হো করে মণিস্মুন্দর উচ্চহাসি হাসলেন। বলেন, গালিটা নতুন নয় সার। ইংরেজও বরাবর আমাদের এই বিশেষণ দিয়ে এসেছে।

অনিরুদ্ধ বলেন, প্রতাপাদিত্য নিয়ে নাটক করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের প্রতাপাদিত্য কি এই ?

মণিস্মুন্দর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে দিলেন : আজ্ঞে না—

তবে ?

মণিস্মুন্দর বললেন, গরজে পড়ে করতে হল। বীররসের নাটকে কেবল সিংহমশায়দের প্রতাপ। প্রতাপসিংহ ভীমসিংহ রাজসিংহ—রাজপুতবীরের ছড়াছড়ি। থিয়েটার দেখে আমাদের বাঙালিরা। মতলব হল, বাঙালি বীর নিয়ে একটা নাটক ফাঁদতে হবে।

তাই বলে এই ? মিথ্যেমিথ্যি কত গুণ চাপিয়েছেন আপনারা প্রতাপাদিত্য আর তার কাল্পনিক মায়ের ঘাড়ে।

মণিস্মুন্দর তবু লজ্জা পান না। বলেন, মিথ্যে বই আমাদের কোনটা সত্যি বলুন তো ? পর্দা টাঙিয়ে দেখাচ্ছি অরণ্য, পর্দা ভুলিয়ে তার উপর আলো ফেলে দেখাচ্ছি নদীর ঢেউ। থিয়েটারে যাঁরা আসেন, মিথ্যের জন্য তৈরি হয়েই আসেন তাঁরা।

অবশেষে অনিরুদ্ধ সন্ধিস্থাপনা করে বললেন, ঐতিহাসিক কথাটা তুলে দিন, তার পরে কিছু আর বলতে যাব না। লোকে জানুক কল্পনার জিনিস। ডায়ালোগ চরিত্র তার পরে একই থাকুক—আমার বিশেষ আপত্তি নেই।

এক থাকলেও অনেক ফারাক সার। কল্পনার গল্প মাটি পায় না, বাতাসে ভাসে। কমবয়সি ছেলে-মেয়ে অনেক আসে, ঝুটো ইতিহাসকেই সাচ্চা জেনে বুক ভরে আত্মবিশ্বাস নিয়ে যায় তারা—এই বাংলার মাটির উপরেই এমনিধারা হতে পেরেছে তো এখনকার আমলেই বা না-হবে কেন ? বানানো গল্প জানলে অত বেশি আপন করে নিতে পারবে না।

অনিরুদ্ধ বিরক্ত সুরে বলেন, কমবয়সি ছাড়াও তো আসে। আপনাদের 'বঙ্গকেশরী' দেখে জ্ঞানবুদ্ধি সব গুলিয়ে যায়।

মণিসুন্দর হাসেন: সুবিধে আছে সার, জ্ঞানী লোকে ঘেন্নায় এ-মুখো বড় হন না। যারা দেখতে আসে, ঝুটো-সাচ্চার তফাত তারা বোঝে না। ঝুটো 'বঙ্গকেশরী'ই, দেখতে পাচ্ছেন, বাজার একেবারে মাত করে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে গেলেন। যা বলেছেন মণিসুন্দর—'বঙ্গকেশরী'র জয়-জয়কার। থিয়েটার মহলে বহুকাল এ রকম শোনা যায় নি। গোড়ার তিনটে চারটে অভিনয় থেকে চাউর হয়ে পড়ল—তারপর আজ সাত মাস ধরে শনি ও রবিবার একনাগাড়ে হাউস-ফুল যাচ্ছে—

উঁহু, ভুল বললাম—মাঝের একটা শনিবার শুধু বাদ। টিকিট প্রায় সব বিক্রি হয়ে হাউস সেদিনও গম-গম করছিল। কিন্তু তারামণি গরহাজির। তারামণির বদলে শৈলবালা অগত্যা রাজমাতা সৌদামিনীর পাঠ করবে। কিন্তু ছাগলের পায়ে যদি ধান পড়ত, কী না হত তবে! বৃত্তান্তটা চাউর হয়ে যেতে বক্স-অফিসে দলে দলে টিকিট ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। অত বড় প্রেক্ষাগৃহে সাকুল্যে জন পঁচিশেক টিম-টিম করছে এখন। মণিসুন্দরকে তারামণি বাবা বলে—তাঁরই আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে সে।

সকলের মন খারাপ। ম্যানেজার লোক পাঠিয়েছিলেন তারামণির আস্তানায়। হঠাৎ আজকে সে আদি-বৃত্তিতে নেমে পড়েছে। মস্তবড় মহফিল। চার-পাঁচটা শৌখিন বাবু এসে জুটেছে—নাচ-গান-হল্লা চলছে, মদের ফোয়ারা উঠে যাচ্ছে। যে ডাকতে গিয়েছিল, তাকে যাচ্ছে-তাই করে শুনিয়েছে: থিয়েটারের কাজ বলে কি একটা দিন দেহের ভাল-মন্দ হতে নেই? যাব না, বলে দাও গে—তাতে চাকরি থাকুক কিংবা চলে যাক।

তার মানে এখন তার স্বাভাবিক অবস্থা নেই—থাকলে এমন সব কথা মুখে বেরুত না। জোরজার্ করে্ এনে স্টেজে দাঁড় করালেও রাজমাতার পাঠ বলা আজ রাত্রে তার ক্ষমতার বাইরে। মণিস্থন্দর ক্ষেপে গেছেন : একশো টাকা ফাইন করলাম। টাকা নগদ দিয়ে পায়ে ধরে মাপ চাইবে, তবে ওকে স্টেজে উঠতে দেব।

হাঁকডাক করে বললেন মণিস্থন্দর। সকলে প্রমাদ গণে। ফাইনের পরিমাণটা কিছু নয়। কিন্তু অত বড় আর্টিস্টের পক্ষে ঘোরতর অপমান। কানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তারামণি ইস্তফা দেবে। আর জুবিলি থিয়েটার মুকিয়ে আছে, বেশি টাকা কবুল করে দলে টানবে।

মণিস্থন্দর নিরুদ্বেগ : যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। তা বলে বেলেল্লাপনা বরদাস্ত করব না। তারামণি ছাড়া থিয়েটার না চলে তো তুলে দেব থিয়েটার।

কিছুই না, ভয়-ভাবনা একেবারে মিছে। পরের দিন থিয়েটারে এসে তারামণি ফাইনের টাকা গণে গণে মণিস্থন্দরের হাতে দিল। পা ছুঁয়ে শতেকবার মাপ চাইছে : কখনো আর এমন কাজ করবে না। সকলের সামনেই করছে এ সব—তারা তো অবাক : মেয়ে-মানুষটার গায়ে বোধহয় মানুষের চামড়া নয়, গণ্ডারের চামড়া। অপমান চর্ম ভেদ করে মর্ম অবধি পৌঁছয় না। ফূর্তি-ফার্তি অধিকন্তু যেন বেড়ে গেল মণিস্থন্দরের মার্জনা পেয়ে।

থিয়েটারের তহবিলে ফাইনের একশো টাকা যথারীতি জমা পড়ল। তারামণিকে তারপর আলাদা ভাবে ডেকে নিজের ব্যাগ থেকে মণিস্থন্দর একশো টাকার ছুটো নোট বের করলেন।

অবাক হয়ে তারামণি শুধায় : ডবল করে দিচ্ছেন কেন বাবা ?

ফাইনের টাকা ফেরত একশো টাকা। আর একশো টাকা তোর অভিনয়ের শিরোপা। স্টেজের উপর অভিনয় করিস, বাড়ির অভিনয় তার অনেক বেশি উতরেছে।

তারামণি বলে, অভিনয়ে টাকা নেওয়া আমার পেশা। কিন্তু কাল রাত্রের কাজও যদি পেশার মধ্যে ফেলি, আমার যে পুণ্যটুকু হয়েছে তা বিক্রি করা হয়ে যাবে।

একটা নোট ফেরত দিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে তারামণি বলে, শিরোপা বলে যা দিচ্ছেন, আমি তা নেব না বাবা।

আজ বলতে বাধা নেই—পুলিশ জালে ঘিরেছিল, কোন রকমে ছেলেটার বেরুনোর আর উপায় ছিল না। ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মাছিটাও গলে বেরুবে হেন সম্ভাবনা নেই। তারই ভিতর তারামণির ঘরে একদল পাঁড় মাতাল সারারাত হুল্লোড় করেছে—সকালবেলা বোতল বগলে প্রকাশ্যভাবে টলতে টলতে বেরিয়ে থার্ড-ক্লাসের ঘোড়ার-গাড়ি খান তিনেক ভাড়া করে চলল। পুলিস ভাল মতন জানে এগুলোকে—পয়লানম্বুরি লুচ্চো বড়ঘরের বয়াটে ছেলে সব। তার মধ্যে একটা যে ভেজাল সেঁধিয়েছে, আলাদা করে তাকে বেছে নেবার তাগত পুলিসের হল না। চাঁদপালঘাট থেকে জাহাজে চেপে দরিয়ায় ভাসল সে। মণিসুন্দর যে যৎকিঞ্চিৎ খেল দেখিয়েছিলেন তারামণির সহায়তায়, এ বৃত্তান্ত কোনদিন কেউ জানল না। রসিক নাগর রূপে সারারাত ছেলেটা হুল্লোড় করেছে, সকালবেলা যাবার মুখে মা বলে তারামণির পায়ের গোড়ায় ঢুম করে এক প্রণাম : যাচ্ছি মা এবার।

এসো—। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে তারামণি কেঁদে ফেলল : যখনই দরকার পড়বে, অভাগিনী মায়ের কাছে চলে এসো বাপধন।

ইংরেজ বিদায় হয়েছে, দিনকাল এখন আলাদা। তারামণি আজও আছে—ধনুকের মতন বাঁকা-দেহ বুড়োথুত্থুড়ে স্ত্রীলোক। মণিসুন্দর নেই—রুবি থিয়েটার নাম বদলে মণিসুন্দরের নামে মণিমঞ্চ হয়েছে। একমাত্র স্বত্বাধিকারী মণিসুন্দরের ছেলে সত্যসুন্দর চৌধুরি। সত্যসুন্দরেরও বয়স হয়েছে বেশ।

॥ দুই ॥

'উঁকিঝুঁকি'—সাপ্তাহিক পত্রিকা। নানান রঙের ছবি ছাপে, যাচ্ছেতাই সব গল্প বানায়। সত্যি তার মধ্যে রতি পরিমাণ, বাকি সব পাঠক- বিশেষ করে পাঠিকা-পছন্দ রংদার বানানো মাল। গল্প বলা হয় আকারে-ইঙ্গিতে—আলো-আঁধারিতেই রোমান্স জমে ভাল। খদ্দেরের কাছে উঁকিঝুঁকি মুড়ি-মুড়কি-তেলেভাজার মতো কাটে।

লেখক সম্পাদক মুদ্রাকর স্বত্বাধিকারী বিনোদ সমাদ্দার—একাধারে সমস্ত। এই বিনোদই সেকালে 'শঙ্খধ্বনি' চালাত। কলমে আগুন ঝরত তখন। ভণ্ড নেতারা তটস্থ। কাগজ বেরুতে না বেরুতে অনুবাদ হয়ে চলে যেত লাটসাহেব অবধি। ফলে জেলের পর জেল—এই বেরুল, দুটো চারটে মাস যেতে না যেতেই আবার ধরে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে ঝামেলা চুকল, 'শঙ্খধ্বনি' উঠে গেল। বিনোদ উদ্বাস্তু। এক ছড়া লিখে 'শঙ্খধ্বনি'র অন্তিম সংখ্যায় সে ছেপেছিল :

> যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, এ তো বড় রঙ্গ,
> ল্যাজা মুড়ো কেটে দেশ করিল ত্রিভঙ্গ।
> কাটুনিরা বঁটি ছেড়ে মসনদে চড়ে—
> উদ্বাহু উদ্বাস্তুগণ জয় জয় করে।

এপারে এসে পড়ে, তখনকার যা দস্তুর, সাকিনশূন্য হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াল বেশ কিছু দিন। বনেদি নেশা যাবে কোথায়—পুনশ্চ কাগজ। 'শঙ্খধ্বনি'র বদলে 'উঁকিঝুঁকি'। যে কালে যার চাহিদা—কলম আজ নটনটীদের কেচ্ছাকাহিনী প্রসব করছে। খুব জমেছে। টাকা পায়—তারও বেশি পায় খোশামুদি। সিনেমা-থিয়েটার রাজ্যে 'বিনু-দা' 'বিনু-দা' নামে সির্নি পড়ে। মুটিয়ে গেছে দস্তুরমতো, ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে।

কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার দরুন 'চার্বাক' নামে আর একটি লেখক জুটিয়েছে। আসল নাম হেমন্ত কর—নাম যেন প্রকাশ না পায়, খবরদার! মাস্টারি করে সে, 'উঁকিঝুঁকি'তে লেখে জানলে চাকরি সঙ্গে সঙ্গে খতম। হেমন্তর কলমটি খুব ভাল, বিনোদ মুক্তকণ্ঠে তারিপ করে। বলে, শালগ্রাম-শিলা দিয়ে পেঁয়াজ-লঙ্কা বাটাচ্ছি। উপায় নেই, ভাল কাগজে যারা ভাল ভাল লেখা ছাপে, তাদের কোটারির মধ্যে ঢোকা তোমার ইস্কুলমাস্টারি ট্যাঁকে কুলোবে না। তা হলেও কোকিল-বাচ্চা তুমি, কাকের বাসায় থেকে কা-কা চেল্লাচ্ছ—কিন্তু 'কুহু' একেবারে ছেড়ো না। আশা জিইয়ে রাখো, কোন একসময় হয়তো দিন আসবে নিজমূর্তিতে বেরিয়ে পড়বার।

হঠাৎ একদিন বলিল, নাটক লেখো দিকি। মণিমঞ্চের মালিক সত্যসুন্দরবাবুকে আমি নিজে গিয়ে ধরব। বাজার-চলতি রদ্দি মাল নয়—যা আমার তিরিশ বছরের ভাবনা, নাটকে গেঁথে দাও তুমি। নাটকের নাম এখনই বলছি: 'প্রতারক'। ঘটনাও আগাপাস্তলা বলব। মাতব্বরটি সকলের হয়ে মাল গস্ত করতে গিয়েছিল—ফিরল ভুষিমাল নিয়ে—নিজের আখের-ইজ্জত গুছিয়ে, অন্য সকলকে পথের-ফকির বানিয়ে। কিন্তু বোঝে না কেউ—ধিতিং-ধিতিং নাচে, আর মাতব্বরের জয়ধ্বনি করে। হাসি-তামাসার নাটক—হাসবে লোকে, কিন্তু হাসির তলায় কান্না—সে কান্নার পারাপার নেই।

হেমন্ত বলে, আপনি নিজে লিখলে তো হয়—

হবে না। আমার কলম একেবারেই জাত খুইয়েছে। আর খুঁজেপেতে যদিই বা সে-কালের কলমটা নিয়ে বসি, রঙ্গরস বেরুবে না—তিরিশ বছরের জমা আগুন বেরিয়ে পড়বে। আর তার যে কি পরিণাম, বুঝিয়ে বলতে হবে না—

হি-হি করে কেমন এক উৎকট হাসি হেসে ওঠে বিনোদ সমাদ্দার। বলে, ইংরেজ তবু আদালতে তুলে রয়ে-সয়ে জেলে পুরত। এঁরা কাঁচা-খেগো দেবতা, সবুর মানে না, ঘোড়া কি ভেড়া চেয়েও

দেখে না। সঙ্গে সঙ্গে মিসা, বা ঐ জাতীয় কোন বেআইনি আইন। তারই হাত ধরে পাতাল-প্রবেশ। দুনিয়া অন্ধকার।

হেমন্ত ইতস্তত করে বলে, আপনি যা পারবেন না, আমি পারব ?

লিখবে, কাটবে, আবার লিখবে। আমি তো পাশেই আছি। না যদি পারো, আমিই লিখব তখন। লিখে স্টিলের কৌটোয় করে মাটিতে পুঁতে রাখব। বলে যাবো, মরার পঞ্চাশ বছর বাদে বের করো। মওলানা আজাদ যেমন করেছেন। ততদিনে হয় তো দিনকাল বদলাবে।

উঁকিঝুঁকির কাছে নানা জনের রকমারি নালিশ, এবং আবদারও। অফিসে এসে পড়ে। গোড়ায় গোড়ায় চার্বাক অর্থাৎ হেমন্ত তো ভয়ে কাঁটা। লেখে কুৎসা-কেলেঙ্কারি—বেশির ভাগই ডাহা মিথ্যে (মজাদার গরমাগরম সত্যি নিত্যিদিন মেলে কোথায় ?)। চ্যাংড়া-চিংড়িরা তো হুড়মুড় করে ঢুকে যায়—ক্রোধবশে হয়তো-বা পায়ের স্লিপার হাতে নিয়ে, এবং যেহেতু হেমন্তর চেয়ার দরজার পাশেই—হাতের মাথায় তার পিঠখানা পেয়ে চটাস-চটাস শব্দে দিল ঘা কতক বসিয়ে! অন্যত্র হুবহু এই ঘটেছে—কাগজে আন্দোলনও হয়েছে এমনি ঘটনা নিয়ে।

দেখেশুনে তারপরে হেমন্ত নির্ভয় হল—না, এ কাগজের অফিসে আগন্তুকদের মারমুখী কেউই নয়। প্রতিবাদ আসে সামান্য দু'চারটে—ডাকযোগেই প্রায় সব। সশরীরে যারা এসে পড়ে, তাদের বরঞ্চ উল্টো রকম দরবার। কুৎসা যথোচিত প্রকট হয় নি, শ্লেষ বক্রোক্তি এবং ভাষার কারিকুরির চোটে আসল বস্তু তলিয়ে গেছে—এমনি ধরনের নালিশ। নতুন মালমশলাও দিয়ে যায় অনেকে, আগামী লেখা যাতে অধিক রংদার হয়ে ওঠে।

নতুন নাটক নিয়ে অতঃপর মণিমঞ্চের সঙ্গে হেমন্তর যোগাযোগ ঘটেছিল। উঁকিঝুঁকিতে যারা দরবারে যেত, তাদের তিনজনকে

অন্তত ওখানে সে চিনতে পারল। একজন শান্তিলতা। বিশাল দেহ নিয়ে বিনু-দা যথারীতি জাঁকিয়ে আছেন। হেমন্ত নিজ টেবিলে প্রুফ দেখছে। কথাবার্তা শুনে সে সকৌতুকে একবার মুখ তুলে শান্তিলতাকে দেখছে। প্রুফ দেখা ভণ্ডুল হয়ে যায়। শান্তিলতা বলছে, আমায় নিয়ে লিখুন দাদা।

আপনার কি আবার ?

শান্তিলতা ফিক করে হেসে পড়ল: মুখ ফুটে বলাই তো মুশকিল।

বিনোদ উৎসাহ দেয়: বলুন, বলুন—অদ্দূর থেকে তোড়জোড় করে বলার জন্যই তো এসেছেন।

মানে, নতুন কিছু নয়। আমাদের বয়সের মেয়েদের নিয়ে যা সমস্ত করে—

[বয়সটা কত শুনি ? বিস্তর কসরৎ করেছ, স্নো-পাউডার মেলা খরচা হয়েছে, বয়সের দাগ চন্দ্রাননে তবু যে দিব্যি উকিঝুঁকি দিচ্ছে। ষোলআনা সামলাতে পারলে কই ?—হেমন্তর স্বগত উক্তি।]

বিনোদও হাসি চাপছে। উদ্বেগের ভাব দেখিয়ে বলে, কি হয়েছে, খুলে বলুন।

ছোঁড়াগুলো পিছু লেগেছে। অকথা-কুকথা বলে আমার উদ্দেশ করে। গায়ের উপর চিঠি ছুঁড়ে দেয়।

[চিঠি তোমার গায়েও—হায় অদৃষ্ট। কলকাতা শহরে স্ত্রীলোকের আকাল পড়ল নাকি ?—হেমন্ত এই সব ভাবছে।]

শান্তিলতা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলছে, পথে বেরুনো দায় হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে এলাম দাদা, বদমাসগুলোকে আচ্ছা করে ঠুকে দিন।

একই সুরে বিনোদ বলে, কলমে ঠুকলে জানোয়ারে জব্দ হয় না দিদি। লাঠি লাগে। পুলিসের কাছে যান, ধরে আগাপাস্তালা ধোলাই দেবে—

[দাদা-দিদি নিয়েই দেখছি দিব্যি লড়ালড়ি এঁদের—কে বড়, কে কার দাদা অথবা দিদি ?]

বিনোদ বলছে, ধোলাই খেয়ে দিব্যজ্ঞান পাবে। যে রোগের যে ওষুধ। তারপরে শত হস্তেন বাজিনঃ—আপনার স্বরূপ বুঝে নিয়ে একশো হাত দূরে দূরে চলবে ছোঁড়ারা।

তবু নাছোড়বান্দা শান্তিলতা : বলেন তো নালিশগুলো আমি আপনার কাছে লিখে রেখে যাই। যে-সব উৎকট প্রস্তাব দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে মারে, তারও দু-পাঁচটা দিয়ে যাব। এত লোক নিয়ে এত সব লিখছেন, আমায় নিয়েও লিখুন কিছু।

বিনোদ বোঝাচ্ছে : আমার কাগজে বেরুলে প্রতিকার হবে না, উৎপাত বেড়ে যাবে বরঞ্চ। এই মানুষকে এত জনে জ্বালাতন করছে, আমি কেন পারব না, আমিই বা কম রোমিও হলাম কিসে ?

তা হোক, উঁকিঝুঁকিতে বেরিয়ে তো যাক। তারপরে দেখা যাবে।

আরও বিস্তর বলে-কয়ে উৎকট প্রেমপত্রের বাণ্ডিল পাঠাবে শাসানি দিয়ে শান্তিলতা বিদায় হল।

বিনোদ বলে, ছাড়বে না, মরীয়া হয়ে লেগেছে। ক'টা দিন আপাতত নিশ্চিন্ত—লোক ধরে ধরে জবর প্রেমপত্র বানানো চলবে এখন। দেখা যাক কি আসে। কিছু না ছেপে রেহাই নেই, বুঝতে পারছি।

পাশের খোপে চায়ের সরঞ্জাম। জল চাপানো হয়েছিল, বাইরের একজন এসে পড়ায় ভৃত্য দেরি করছিল। শান্তিলতা চলে যাবার পর চা বানিয়ে এনে দিল—কাপে চা, প্লেট দুটোয় সন্দেশ ভরতি।

হেমন্ত অবাক হয়ে বলে, সন্দেশ কোথায় পেলি হরেকেষ্ট ?

উনিই তো আনলেন। বাক্সটা আমার হাতে দিয়ে তারপরে ঘরে ঢুকেছিলেন।

বিনোদ হাসতে হাসতে বলে, নাঃ, লিখতেই হবে। প্রেমপত্র আসুক বা আসুক সন্দেশের উপর নিমকহারামি করতে পারব না—

হেমন্তর দিকে তাকিয়ে বলে, শেষ চেষ্টা। শত কসমেটিকেও কুলোচ্ছে না। এখন যা করে উঁকিঝুঁকি। সন্দেশের বাক্স নিয়ে সুপারিশ ধরেছে।

হেমন্ত মানে বোঝেনি, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

বিনোদ বলে, মণিমঞ্চে এখন মাসি-পিসি সাজে—রংতামাশা করে। তার মানে, বয়স হয়ে গেছে আর কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে হয়েছে, কর্তাদের সেটা নজরে পড়ে গেছে। এর পরেই আসবে ঝিয়ের পার্ট। তার কিছু পরেই অবসর—মঞ্চের উপর প্রবেশ-নিষেধ। সেইটে যদি খণ্ডন হয়।

হেমন্ত শুধায়: মস্তান ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

ছোঁড়া-টোঁড়া বানানো—এটা বুঝলে না? আসল হল, উঁকিঝুঁকিতে কিছু রসালো গল্প আর প্রেমপত্র বেরুনো। তবে তো শান্তিলতার উপর এখনো লোকের নজর ধরে। কমেডিয়ান থেকে হেন ক্ষেত্রে উপনায়িকা-সহনায়িকায় প্রোমোশন পেলেও পেতে পারে। শান্তিলতার শেষ আশা—উপরওয়ালা যদি ধাপ্পায় পড়ে যায়।

উঁকিঝুঁকি-অফিসে মণিমঞ্চের আরও এক আর্টিস্ট একদিন গিয়ে পড়ল। সাধন মজুমদার—কমেডিয়ান বলে তার রীতিমত খ্যাতি। অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তার মানে নাট্য-সমালোচনা লিখতে হবে। এসব কাগজের কাজই এই। ছাপা কার্ড সাধন সসম্ভ্রমে বিনোদের হাতে তুলে দিল।

চাকরি স্থলে কাজ না থাকলে বাইরের অভিনয়ে বাধা নেই। এই পন্থায় কিছু উপরি-রোজগার। আবার মুফতেও করে—ভিন্ন ধরনের পার্ট করে মুখ বদলানো যায়। তেমনি এক ব্যাপার—নিমতিতা বারোয়ারিতলায় সীতার অভিনয়।

বিনোদ বলে, তোমার কি পার্ট সাধন? ঢাকের মতন মাদুলি ঝুলিয়ে বলবে, আমার এটি মাদুলি নয়—বাবাদুলি, তাই না?

সাধন মজুমদার ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, যেখানে যাই, এমনি সব কথা। বাল্মিকী করব আমি। যাবেন দয়া করে।

বিনোদ বলে, সীতা নাটক ডি. এল. রায়ের আর যোগেশ চৌধুরির। নতুন কেউ লিখেছেন বুঝি বাল্মিকীকে বিদূষক বানিয়ে?

সাধন দুই হাত যুক্ত করে বলে, সেই জন্যেই তো এত করে বলছি। গিয়ে দেখবেন, মনোরঞ্জন ভটচাজের চেয়ে খুব খারাপ হবে না।

বিনোদ বলে, তদ্দূর যাওয়া হয়ে উঠবে না সাধন। অভিনয় করে সুভালাভালি ফিরেছ, খবরটা দিও। তারপরে ঢেলে লিখব তোমার যদি উপকারে আসে। মহর্ষি মনোরঞ্জন ম্লান হয়ে গেছেন, লিখে দেব।

মুখ তুলে সাধনের চকিত প্রশ্ন: ফেরার কথা বলছেন কেন?

মফস্বল জায়গা কিনা। না-পছন্দ হলে শহরের মতন সিটি মেরেই সারা করে না। ইট মেরে ধরাশায়ী করে দেয়। স্টেজ থেকে আর্টিস্টকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে তোলে।

সাধন মজুমদার আহত কণ্ঠে বলে—জানেন না সার, পাবলিক থিয়েটারে গোড়ায় গোড়ায় আমি সিরিয়াস পাঠে নামতাম। জুবিলি থিয়েটারের 'পিতাপুত্রে' জনার্দন রায় সেজেছিলাম। কমেডিয়ান নিতাই সাধুর একদিন ধাইপাই জ্বর এল। তখন নতুন গিয়েছি—ম্যানেজার বলল, জনার্দন রায়ের ডুপ্লিকেট আছে। নিতাইয়ের দু-সিনের পাঠটুকু চালিয়ে দাও তুমি—এই চারটে পাঁচটা রাত, তার মধ্যে নিতাই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সাদামাটা জ্বর ভাবা গিয়েছিল, সেখানে টাইফয়েড। খুব বেশি তো পাঁচ রাত্রি, সকলে আন্দাজ করেছিল—সেখানে পাক্কা পাঁচ মাস কাটিয়ে সেরে-সুরে সুস্থ হয়ে নিতাই এল। নিতাইয়ের কমিক পাঠেও খুব জমিয়েছি—ফিরে আমি নিজের পাঠে গেলাম। ইতিমধ্যে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেছে—যা বলি, লোকে হাসে। রেগেমেগে জনার্দন রায়

ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বউ এসে পা জড়িয়ে ধরল তো পায়ের ধাক্কা বউকে। কত যেন রঙ্গরসের ব্যাপার—মুখের কথা শুনতে দেয় না, হাসির হুল্লোড়। ম্যানেজার গ্রীনরুমে ছুটে এসেছে। চোখে আমার জল এসে গিয়েছে তখন—জনার্দন রায়ের গোঁফ আর চাপদাড়ি ছুঁড়ে দিলাম বদ্যিনাথের দিকে, জনার্দন কেড়ে নিয়েছে সে—আমার এত সাধের সাজানো জিনিস। ম্যানেজারও বলল, পরের সিন থেকে তুমিই চালাও বদ্যিনাথ, সাধনকে ঐ পাঠে লোকে আর নিচ্ছে না। পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার বলল, অভিনেতা বৈদ্যনাথ ট্রেন ফেল করে সময়মত পৌঁছতে পারেন নি। আগের সিন অন্যকে দিয়ে চালানো গেছে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এসে গেছেন—ইত্যাদি।

হেমন্তর চোখে-মুখে বুঝি সমবেদনার ভাব দেখতে পেয়েছে। তার দিকে ফিরে সাধন সকাতরে বলে, আমাদের অবস্থা বাইরে থেকে ঠিক আন্দাজে আসে না। কাজ মন্দ হলে কপালও মন্দ, নাটক থেকে বিদায়, চাকরি খতম। কিন্তু উৎকৃষ্ট কাজেরও উৎকট পরিণাম। যেমনধারা আমার হয়েছে—রাতের পর রাত ভাঁড়ামি করে যাচ্ছি। ধরুন, কোন এক নাটকে ঝগড়াটে চরিত্রে কেউ খুব জমিয়ে নিয়েছে। তারপর যে নাটকই হোক, স্টেজে উঠে তাকে কেবল ঝগড়া করতে হবে। নাটকে না থাকলেও ফরমাশ দিয়ে তার জন্য ঝগড়ার দৃশ্য লেখানো হবে। যেন মিষ্টি কথা ভাল কথা তার মুখ দিয়ে বেরুবে না, গলায় আটক হয়ে থাকবে। তেমনি খল চরিত্র যে ভাল করল, সারা জন্ম স্টেজের উপর তাকে ভ্রূ কুঁচকে খল হয়ে বেড়াতে হবে। নায়কে যে একবার নাম করল, বাহাত্তর বছরে পৌঁছেও সে মেকআপ ম্যানকে বলবে সাতাশ বছরেরটি বানিয়ে দাও আমায়। গ্রহের ফেরে আমি ভাই কমেডিয়ান বনে গেছি। কেমন করে রেহাই পাই, এখন আঁকুপাকু করছি। পাবলিক থিয়েটারে ছাড়বে না—বাইরে যা করি, সব জায়গাতেই গুরুগম্ভীর

পাঠ। আপনাদের উঁকিঝুঁকিতে যদি ভালরকম একটু প্রচার পাই, হয়তো-বা ভাঁড়ামি থেকে নিস্তার পেয়ে কোন একদিন ভদ্রলোক হয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচব।

একদিন এক ঝকমকে মেয়ে এসে উপস্থিত। যুবতী, এবং রূপসী দস্তুর মতো। সিনেমা-থিয়েটারের নয়—অফিসে কাজ করত, এখনো করে কিনা জানা নেই—ওভারসীজ মার্কেটিং কোম্পানিতে। নাম জয়ন্তী মিত্তির।

নামটা শুনেই বিনোদ বসুন, বসুন—করে সামনের চেয়ার দেখাল। এবং পাশের খোপের উদ্দেশে হাঁক দিলঃ চা-টা নিয়ে আয় হরেকেষ্ট। কেবল মাত্র চা নয়, চা-টা। নিজের টেবিলে হেমন্ত ঘাড় নিচু করে প্রুফ দেখছিল, আদেশ শুনে চকিতে ঘাড় তুলে দেখে নিল মেয়েটিকে। বিনোদ খাতির করছে তাকে—মধ্যম রকমের খাতির অবশ্য। হরেকৃষ্ণকে বলার মধ্যে সঙ্কেত আছে। একটা চা তিনটে চা—এই রকম নিরলঙ্কার ভাবে যখন বলবে, শুধুমাত্র চা-ই আসবে, সঙ্গে আর কিছু নয়—কাপের সংখ্যা আদেশ অনুযায়ী এক বা তিন। চা-টা শব্দের অর্থ চায়ের সঙ্গে দুখানা বিস্কুট—জয়ন্তী সম্পর্কে সেই আদেশ হল। আর যখন বলা হবে, চা দিয়ে যাও হরেকৃষ্ণ—বিশেষ সম্ভ্রমশালীর আগমন হয়েছে, বুঝবে তখন। পাশের দোকান থেকে একখানা সিঙাড়া ও একটি রসগোল্লা চায়ের সঙ্গে যোগ হয়ে আগন্তুকের সামনে আসবে।

জয়ন্তী মিত্তিরের নাম ও কেচ্ছা-কাহিনী কিছু কিছু জানা আছে—মুখোমুখি এই প্রথম। সুবিখ্যাত অভিনেতা প্রেমাঞ্জনকে জড়িয়ে রসালো রটনা—ব্যাপার সামান্য নয়—আর এই সমস্ত নিয়েই তো উঁকিঝুঁকির কাজকারবার। চা-টার অর্ডার দিয়ে নিজ চেয়ারে বিনোদ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলঃ বলুন—

বলবে কি জয়ন্তী, কেঁদেই আকুল। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে

বলতে হয় তবু দু-এক কথা। স্বামী তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বেধড়ক পিটুনি দেয় কথায় কথায়—সর্বাঙ্গে কালশিরে বটে গেছে। গা খুলে দেখানো যায় না যে—দেখলে ঠিক ক্ষেপে যেতেন।

অপরাধটা কি?—বিনোদ শুধায়।

জয়ন্তী বলে যাচ্ছে, প্রেমাঞ্জনের কথা আপনার কাছে কি বলব। তাঁর নামযশের মূলে তো আপনি। আমাদের অফিসেই কম মাইনের সামান্য কেরানি ছিলেন—পজিসন আমারও অনেক নিচে। মণিমঞ্চের সঙ্গে আপনিই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। আজ তাঁর জয়জয়কার। নটাধিরাজ বলে সকলে। তাঁর অভিনয় আমার দারুন ভাল লাগে।

কথা যাতে সংক্ষেপে শেষ হয়—বিনোদ মাঝখান থেকে প্রশ্ন করল: অপরাধ এই? তা হলে আপনি তো একা নন—কলকাতা শহরের অন্তত অর্ধেক মেয়ে-বউ এই অপরাধে অপরাধী।

ম্লান হেসে জয়ন্তী বলল, আমার হল ডবল অপরাধ—শাখের করাতের মতো দু-দিকে কাটছে। প্রেমাঞ্জনের অভিনয় আমার ভাল লাগে। তেমনি আমার অভিনয়ও প্রেমাঞ্জন বড় পছন্দ করেন।

বটে!—সবিস্ময়ে বিনোদ তাকিয়ে পড়ল: আপনি অভিনয় করেন নাকি? উঁকিঝুঁকির এডিটার হয়েও এ খবর তো কানে যায় নি।

যেতে দিলে তো। সেই তো দুঃখ আমার। দেহের মার মারছে, আর মনের দিক দিয়ে একেবারেই মেরে ফেলছে আমার। দেহে কালসিটে, মনও কালি-কালি হয়ে গেছে।

জয়ন্তী কেঁদে পড়ল। চোখে জল গড়াচ্ছে। আঁচলে জল মুছে কিছু শান্ত হয়ে আবার বলে, অফিসের ড্রামাটিক ক্লাব বলতে গেলে প্রেমাঞ্জনের সৃষ্টি। চাকরি ছেড়েছেন, কিন্তু ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়েননি। পাঠ বিলি থেকে শুরু করে প্রতি জনকে ধরে ধরে

শেখান। এমেচার মহলে ওভারসীজ ক্লাবের সেইজন্য এত নাম। ও-বছর 'রানী দুর্গাবতী' হয়েছিল—রানী দুর্গাবতীর পাঠ প্রেমাঞ্জন আমাকেই দিলেন।

প্রেমাঞ্জনের ধরাধরিতে গিয়েছিলাম বটে 'রানী দুর্গাবতী' দেখতে। সত্যিই ভাল হয়েছিল। কিন্তু দুর্গাবতী কি আপনি সেজেছিলেন?

স্মৃতি মন্থন করে বিনোদ ঘাড় নাড়ল: আপনি নন—যদ্দূর মনে পড়ছে, কুসুমলতা—

শেষ পর্যন্ত ঐ কুসুমলতা। প্রেমাঞ্জনের সঙ্গে নাকি আসনাই আমার, জোড়ে খুন করবে আমাকে আর প্রেমাঞ্জনকে—স্বামী এই সমস্ত তড়পে বেড়াতে লাগল। প্রাণের দায়ে দুর্গাবতীর পাঠ ছুঁড়ে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে একেবারে লক্ষ্ণৌ জামাইবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠতে হল। কুসুমলতারা হল ভাড়াটে প্লেয়ার—ক্লাবের অভিনয়ে ওদের কাউকে আনবেন না, প্রেমাঞ্জন পণ করেছিলেন। আমায় না পেয়ে শেষমেশ ঐ কুসুমের হাতে-পায়ে ধরে নগদ একশো টাকা কবুল করে তাকেই দুর্গাবতী সাজিয়ে নামালেন। সুযোগ আমার মুঠোর মধ্যে এসেও ফসকে গেল—

কথার মাঝে গর্জে উঠল জয়ন্তী: আমার ঐ দুশমনটার জন্য। স্বামী বলিনে—দুশমন। সম্পর্ক কাটিয়ে সেই থেকে আলাদা থাকি।

বিনোদ লুফে নিয়ে বলে, খাসা করেছেন। যেমন কর্ম তেমনি ফল। বুঝুন এইবারে বাছাধন, স্ত্রী মানে খেলার পুতুল নয়—তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করা চলে না।

জয়ন্তী অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, আপনি কিছু লিখবেন না? আপনার কলমে হীরের ধার।

লিখব না মানে?—বিনোদ আকাশ থেকে পড়ল: কাজই তো আমাদের এই—গোপন কুচ্ছোকথা বাইরে চাউর করি দেওয়া। ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে গুহ্য খবর টেনে বের করি, কাগজের নাম তাই

উঁকিঝুঁকি। আপনি এসে পড়ে আমাদের কাজটা এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

পরমাগ্রহে জয়ন্তী প্রশ্ন করে: কবে বেরুবে?

শুক্কুরবারে কাগজ বেরুবে, সেই সংখ্যাতেই কিছু পাবেন। তারপর হপ্তায় হপ্তায় পেতে থাকবেন। যা বললেন, মোটামুটি এই সমস্ত—কিছু কিছু রংদার মশলা-মেশানো। আপনি চলে গেলেই দরজা ভেজিয়ে কলম নিয়ে বসব।

চা-বিস্কুট শেষ। অতএব নিজ স্বার্থেই জয়ন্তী এবার উঠল। ট্যাক্সি সেই থেকে রাস্তায় অপেক্ষা করছে। কথা বলতে বলতে বিনোদ এগিয়ে দিচ্ছে। অফিসের বাইরে আমাকেই জয়ন্তী খপ করে হাত জড়িয়ে ধরল: একটা দরবার—

একগাল হেসে বিনোদ বলে, হাত ছেড়ে মুখেই বলুন না।

মণিমঞ্চের কর্তা সত্যসুন্দরবাবু আপনাকে বড় খাতির করেন। আমার কথা তাঁকে একটু বলুন না।

নিশ্চয় বলব—একশো বার বলব।—বিনোদ সমাদ্দার একেবারে গঙ্গাজল। জিজ্ঞাসা করে, পাবলিক থিয়েটারে নামতে চান?

এখন আর বাধা কিসের—কাকে ডরাই? প্রেমাঞ্জনের দৃষ্টান্ত তো চোখের উপর দেখছি। সামান্য করেসপণ্ডেন্স-ক্লার্ক থেকে কোথায় উঠে গেছেন।

বিনোদ উসকে দেয়: আপনিও যে কি হবেন কোথায় উঠবেন, কেউ বলতে পারে না।

জয়ন্তী বলল, আপনাকে দেখানোর সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু অভিনয় সত্যিই আমি খারাপ করিনে—

শেষ করতে দিল না বিনোদ: খুব ভাল করেন আপনি। দেখতে হবে কেন, কথাবার্তা চালচলন থেকেই বুঝে নিয়েছি।

গাড়িতে উঠে হাসি-ভরা মুখে বলে, দরবার মঞ্জুর তা হলে?

বিনোদ বলল, দরবার কিসের। নাট্যামোদী হিসাবে আমারই

তো কর্তব্য। রঙ্গমঞ্চকে যারা ভালবাসে, সবাই আপনাকে চাইবে।

জয়ন্তীকে ছেড়ে এক-ছুটে ঘরে ঢুকে বিনোদ সত্যি সত্যি দরজা ভেজিয়ে দিল। হেমন্ত শুধায়ঃ লিখবেন এখনই?

না, হাসব। দম ফেটে মরে যাচ্ছি, হেসে হালকা হয়ে নিই খানিক। মদ্দাহাঁসের মতন ফ্যাসফেসে গলা—তিনি নাকি স্টেজে দাঁড়িয়ে অ্যাক্টো করবেন, দ্বিতীয়-প্রেমাঞ্জন হবেন—কর্তামশায়ের কাছে তাঁর জন্যে বলতে হবে আমায়।

খিকখিক করে বেশ একচোট হেসে নিল সে। গলায় মেরে দিয়েছে—নয়তো অভিনয়ে পরিপক্ক মানতেই হবে সেটা। কথার সঙ্গে চোখ দুটোয় ইচ্ছে মতন ঝিরঝিরে পানি, ইচ্ছে মতন ঝিকমিকে হাসি। সরোজা যেমন করত। বলি, যেসব কথা হচ্ছিল শুনেছ তো সব?

প্রুফ থেকে মুখ তুলে হেমন্ত ঘাড় নাড়লঃ যৎসামান্য, কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আর অদ্দূর থেকে স্পষ্ট তেমন কানেও আসে না।

নাঃ, বদরসিক তুমি। হাতের কাজ বন্ধ রেখে কানটা খানিক বাড়িয়ে দিলেই কানে আসত। এমন-কিছু ফিসফিস করে বলেনি।

হেমন্ত বলে, অন্যের গোপন ব্যাপার শোনা ঠিক হত কি? বিশেষ করে মহিলার ব্যাপার।

গোপন ব্যাপার নিয়ে মহিলা নিজেই বেশি করে ঢাক পেটাতে চায়। এসেছে তো সেই তদ্বিরে।

বিনোদ চুম্বকে বৃত্তান্ত বলল। বলে, জাতক্রোধ স্বামীর উপর—সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করছিল দেখলে না? দুর্মতি পুরুষ দশের মাঝে মুখ না দেখাতে পারে, এমনি কাণ্ড করতে চায়।

হেমন্ত বলে, এই সংখ্যাতেই খানিকটা দেবেন, বলে দিয়েছেন। মোটে কিন্তু জায়গা নেই। কম্পোজ-করা ম্যাটার তাহলে চেপে রাখতে হবে।

বিনোদ সহাস্যে বলল, এ সংখ্যায় নয়—কোন সংখ্যাতেই নয়। জয়ন্তী মিত্তিরের কোন কথাই উঁকিঝুঁকিতে বেরুবে না।

কিন্তু আপনি কথা দিলেন—

আমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—এদ্দিন একসঙ্গে কাজ করে এখনো সেই ধারণা তোমার? আগাপাস্তলা মিথ্যে দিয়ে কাগজ ভরাই, ধারণা তবু যায় না। নাঃ, লেখক হলে কি হবে—জাত-ইস্কুলমাস্টার তুমি।

হেমন্ত তবু বলে, মহিলা এত কান্না কেঁদে গেলেন, স্বামীর উপরে সত্যিই আমার রাগ হচ্ছে।

আমারও হচ্ছে, অপদার্থ স্বামীটার উপরেই—সত্যি সত্যি কেন পিটুনি দেয় না? কেন দেয় না, একেবারে যে না-বুঝি তা নয়। সোনার অঙ্গে হাত তুলতে মায়া লাগে।

—বিনোদ সমাদ্দার বলতে লাগল, স্বামী প্রদীপ মিত্তির—তাকে আমি চিনি। সুন্দরী বউ পেয়ে হতভাগার গদগদ অবস্থা। আর ইনি শুধু তারই জীবন নয়, প্রেমাঞ্জনের জীবনও বিষময় করে তুলেছেন। সুন্দরী যুবতী মেয়ে বাড়িতে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে সামনের উপর বিতিকিচ্ছি কাণ্ডবাণ্ড করতে লাগলে সাময়িক দুর্বলতা আসা, প্রেমাঞ্জন কেন, ঋষিতপস্বীর পক্ষেও অসম্ভব নয়। তারই সুযোগ নিচ্ছে সাংঘাতিক সর্বনেশে মেয়েটা। একেবারে পেয়ে বসেছে। একে নিয়েই পুরোদস্তুর আলাদা এক নাটক লেখা যায়।

॥ তিন ॥

মণিমঞ্চ। শনিবার—থিয়েটারের দিন আজ। আরম্ভের এখনো ঘণ্টা দুই বাকি। লোকজন সামান্যই এখন। সত্যসুন্দর নিজের কামরায় নিবিষ্ট মনে জমা ও খরচের হিসাব মিলিয়ে দেখছেন।

মথুরানাথ নামে পরম বিশ্বাসী ছোকরা দরজার বাইরে যথারীতি টুল পেতে আছে। যতক্ষণ সত্যসুন্দর আছেন, সে থাকবে। স্লিপ নিয়ে মথুরা ভিতরে ঢুকল। তিলেক মাত্র অপেক্ষা নয়, পিছু পিছু ঢুকল বিনোদ সমাদ্দার। এবং তার পিছনে হেমন্ত কর।

তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে 'এসো' 'এসো' বলে সত্যসুন্দর আহ্বান করলেন।—তোমার উঁকিঝুঁকি চলছে কেমন?

খুব ভাল।—হেসে হেসে বিনোদ বলছে, সোনার বঙ্গভূমে ইক্ষু-রস চলে না, তাড়ি বানিয়ে দিলে তখন আর পড়তে পায় না। কাগজ বেরুতে না বেরুতেই শেষ—চাহিদা অনুযায়ী মাল যোগান দিয়ে উঠতে পারি নে।

ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকার পর বিনোদ হেমন্তর নাম-ধাম-পরিচয় দিল। বলে, শিক্ষকতা করেন। আবার লেখকও—আমার উঁকি-ঝুঁকিতে লেখেন। বাজারে তিন-চারটে বই বেরিয়ে বেশ নাম পড়ে গেছে। নাটক লিখেছেন, বলে-কয়ে আমিই লিখিয়েছি। অমিয়-শঙ্করের সঙ্গে সেই সূত্রে মোটামুটি কথাবার্তা হয়েছে। সে কোথায়?

আসেনি তো এখনো।

এইসময় আমাদের আসতে বলেছিল—

বাইরের মথুরানাথকে সত্যসুন্দর হেঁকে বললেন, নতুনবাবুর ঘরে গিয়ে দেখে আয়, সে এসেছে কিনা। কখন আসবে, খোঁজখবর নিস।

নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'জয়-পরাজয়ের' গতিক বোঝা যাচ্ছে না,

শুনেছ নিশ্চয় অমিয়র কাছে। এসে পড়েছ যখন, আর একবার দেখ।

আরে সর্বনাশ। আজ কাগজ বেরুবে, কেটে ফেললেও অতক্ষণ থাকতে পারব না।—তারপর বলে, মণিমঞ্চের ভার অমিয়র উপর ছেড়ে দিলে। এবারের বই তো সে করবে।

ছেলেপুলে নেই, চোখ বুঁজলে ওরই তো সব। করতে চাচ্ছে, করুক। চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, যা সে করবে নির্ঘাৎ সুপার-হিট। দেখা যাক।

একটু থেমে বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দু-পুরুষ থিয়েটার নিয়ে আছি। কিন্তু এখনকার এদের, মনে হচ্ছে, একটুও চিনিনে। অমিয়ও তাই বলে—সেকেলে হয়ে গেছি, নতুন জেনারেশনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে—দিবারাত্রি ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান। স্টেজে একেবারে নাকি নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আসবে। আমিও কড়ার নিয়েছি, অমিয়শঙ্কর সর্বময়—তাকিয়েও দেখব না আমি, চোখ বুঁজে থাকব।

বিনোদ বলল, সেই রকম কথা আমার সঙ্গেও হয়েছে। পুরনো ঘাগিদের বাঁধাছকের নাটক নেবে না সে। হেমন্তর কদর তো সেইজন্য।

সত্যসুন্দরের সকল দৃষ্টি এবার হেমন্তর উপরে। সাগ্রহে শুধালেন: আপনার কোন কোন বই, বলুন তো?

হালের উপন্যাসটা উতরেছে চমৎকার। কাগজে কাগজে প্রশংসা। এই নামটাই তার সর্বাগ্রে মনে পড়ল: কান্না—

আকাশ-পাতাল হাতড়েও সত্যসুন্দর হদিস পান না। বললেন, কান্নাকাটি লোকে তো তেমন নেয় না শুধু স্ত্রীলোক ছাড়া। বলে, সংসারে কান্নাকাটি লেগেই আছে—আবার এখানেও? 'কান্না' নামের বই—কই, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। বলি, হিন্দী না বাংলা?

মনে মনে বিরক্ত হয়ে হেমন্ত বলে, বাংলাতেই লিখি আমি।

তাই তো। কিছু মনে করবেন না মশায়, বোধহয় ফ্লপ-বই। তা হলেও বিলকুল ভুলে যাব—এমন তো হয় না। সুপার-ফ্লপ নাকি—এক-আধ নাইটেই খতম? বলো না বিনোদ, কী ব্যাপার।

বিনোদ তো হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বলে, সিনেমায় হয় নি, থিয়েটারেও নয়। তোমার মনে পড়বে কি করে? লাইনে হেমন্ত আনকোরা নতুন, তোমায় বললাম তো সে-কথা।

হতবুদ্ধি হেমন্তকে ফিসফিসিয়ে বুঝিয়ে দেয়: বই বলতে এরা বোঝে সিনেমা-ছবি কিংবা থিয়েটারের পালা। তার বাইরে বই এরা আমলে আনে না। পড়ে না এরা—চোখে দেখেন, আর কান দিয়ে শোনে।

সত্যসুন্দরকে বলে, ধরেছ ঠিক। আজতক হেমন্তর কোনও বই হয়নি। নতুন বই নিয়ে প্রথম এই থিয়েটারে পা দিয়েছে।

বেশ, বেশ!—সত্যসুন্দর বললেন, অমিয়ও ভরসা দিয়েছে—তবে আর কি! নাম কি নাটকের?

হেমন্ত বলল, প্রতারক—

ক্রাইম ড্রামা বুঝি?

বিনোদ লুফে নিয়ে বলে, এর চেয়ে বড় ক্রাইম হয় না। বিশ্বাস-ভঙ্গ। মুখে লম্বা লম্বা রচন আউড়ে ভদ্রসজ্জন মক্কেলদের ধীরে ধীরে গুণ্ডা লুচ্চো কালোবাজারি বানানো।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন সত্যসুন্দর: বটে!

মজাটা হল, তলিয়ে বোঝে না তারা কেউ। সর্বনাশ হয়ে গেল, অথচ স্ফূর্তির চোটে তারাই ধিতিং-ধিতিং নাচে।

সত্যসুন্দর গম্ভীর হয়ে রায় দিলেন: সিরিও-ঝমিক বই—জমতে পারে। এ লাইনের নাড়িনক্ষত্র তোমার মতন ক'জন জানে? তুমি যখন পিছনে রয়েছ—

হেমন্ত বলে ওঠে, পিছনে থাকা কি, নাটক আসলে বিনুদারই।

প্লট, চরিত্রের বুনানি সমস্ত ওঁর। ওঁর মুখের কথা আমি শুধু কাগজের উপর সাজিয়ে গেছি।

সত্যসুন্দর শুধালেন: উপসংহারটা কী রকম দাঁড় করালে—জেল না, ফাঁস?

কিছু না, কিছু না। নাটকের বাহাদুরি এইখানে। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় স্টেজে দেখে দেখে চোখ পচে গেছে—সাদা চোখে ক'টা দেখেছ, আঙুলে গণে বলো দিকি। যা সত্যি, নাটকও ঠিক তাই। গদি, শিরোপা—প্রতারকের পুরস্কার। ভাটেরা চিল্লাচ্ছে: এত গুণান্বিত দুনিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়টি নেই—তারই মধ্যে ড্রপ পড়ল।

হেনকালে মথুরানাথ এসে খবর দিল, নতুনবাবু নিজের ঘরেও নেই। হাবুলকে বলে গেছেন, আসতে একটু দেরি হবে—কেউ এসে চলে না যান।

বিনোদ বলল, আমার কী দরকার—আমি চলি কর্তামশায়। নাট্যকার রইল।

নিচের বক্স-অফিস। কাউন্টারের পিছনে তিনজন। একজনের হাঁটুর উপর নভেল খোলা—নির্বিঘ্নে পড়ছে। আর দু-জন হাই তুলছে বসে বসে, খদ্দের এলে টিকিট দিয়ে ঢেরা কাটছে চার্টের উপর। 'জয়-পরাজয়' চলছে—এমন-কিছু পুরনো নাটক নয়। সুবিখ্যাত জগন্ময় রায়ের রচনা। বাঘা বাঘা প্লেয়ার। একজন কেবল দেহ রেখেছেন—রজত দত্ত। তবু বাকি যাঁরা আছেন—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হ্যাণ্ডবিলে আছে: অষ্টবজ্র সম্মেলন—

কিন্তু ভিড় কই তেমন?

জন আট-দশ লাউঞ্জের গদিতে গা এলিয়ে আছে। আর কিছু

লোক দেয়ালের গায়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছে। দেয়াল জুড়ে 'জয়-পরাজয়ে'র নানা দৃশ্যের ফটোগ্রাফ। জনৈক ঝানু ব্যক্তির আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন: ইনি কে, বল তো কাটু।

কাটু নামের ব্যক্তিটি, বোঝা যাচ্ছে, তাদৃশ ধুরন্ধর নয়—প্লেয়ারদের কুলজি নিয়ে তত বেশি মাথা ঘামায় না। কাটুর পাল্টা প্রশ্ন: সাধন মজুমদার?

হাসির চোটে ছাত ফেটে যাবার গতিক। তাড়াতাড়ি লোক বদলে কাটু বলে, বোদে চক্কোত্তি বোধহয়।

বোদে ভিলেন সাজে, সাধন কমেডিয়ান—বিতিকিচ্ছি সাজগোজ দেখেই ধরে নিলি ঐ দুয়ের একজন না হয়ে যায় না।

এলেমদার তৃতীয় এক ব্যক্তি মাথা গলিয়ে সমাধান করে দিল: আরে, এ তো প্রেমাঞ্জন। সিনেমা-থিয়েটার আসেন আর প্রেমাঞ্জনকে চিনতে পারেন না—কী কাণ্ড।

কাটু রে-রে করে ওঠে: প্রেমাঞ্জন বই কি। সেদিনও তাকে ক্রাউনে দেখেছি। সিরাজদৌল্লা সেজেছিল। লম্বা-চওড়া চোখ-জুড়ানো চেহারা—ঘ্যাচাং করে মীরন তলোয়ার বসিয়ে দিল, গোটা হল হায়-হায় করে উঠল। কপালে আব কানা-চোখ কটকটে কালো এ মানুষ কেন প্রেমাঞ্জন হতে যাবে?

ক্রাউনের নবাব মণিমঞ্চে এবারে যে খুনে ফেরারি জিতু পাহাড়ি। প্রেমাঞ্জন জিতু পাহাড়ি সেজেছে। অ্যাকটিংয়ে প্রেমাঞ্জন সিদ্ধপুরুষ, মেক-আপেও তাই।

এক দঙ্গল কাউণ্টারে ঝুঁকেছে। মফস্বলের মানুষ—কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে।

আরম্ভ ক'টায়?

কাউণ্টারের লোক পোস্টার নির্দেশ করে বলে, ছাপা রয়েছে, দেখুন না—

মানুষটি ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ছাপা-জিনিস ঢের ঢের দেখা আছে

মশায়। আপনাদের ছ'টা ঠিক ঠিক ক'টার সময় বাজবে, জিজ্ঞাসা করছি।

আরও প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেয়ঃ ঘর-বাড়ি আমাদের এখানে নয়। সারাটা দিন টহল দিয়েছি। সাড়ে-সাতটা নিদেন পক্ষে সাতটা অবধি সময় পেলেও হোটেলের পাট সেরে একপিঠে হয়ে বসতে পারি।

কাউণ্টার বলে দেয়ঃ ঘড়ি ধরে থিয়েটারের কাজকর্ম। পাঁচটা-উনষাটের পর আর একটা মিনিট—সিকিমিনিটও তার এদিক-ওদিক হবে না। থার্ড বেলের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরে অরণ্যের সিন।

পুনরপি প্রশ্নঃ ভাঙবে ক'টায়?

ন'টা চল্লিশে। সে-ও ঘড়ি-ধরা।

নিজেদের মধ্যে তখন তারা বলাবলি করছে, এই হয়েছে আজকাল। শহরের লোকের মুখ চেয়ে যত নিয়মকানুন—খেতে শুতে যাতে বেশি রাত না হয়ে যায়। দশ বাজবার আগেই এরা তো চুকিয়েবুকিয়ে দিচ্ছেন, আমরা হতভাগারা তখন কোন চুলোয় যাই—কে ভাবতে যাচ্ছে বল।

থিয়েটারের সেই সত্যযুগীয় প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। একই রাত্রে তিন-চারখানা নাটক হত তখন। একটা হয়ে গেল তো আর একটা। শেষ নাটকটা শেষ হয়ে গিয়ে সর্বশেষ ড্রপ পড়ল—বাইরেও তখন ফর্শা। ময়লার গাড়ি ছড়-ছড় করে যাচ্ছে। রাত কাটানোর ঝামেলা নেই—গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে চারপয়সার কচুরি আর এক পয়সার হালুয়ায় জলযোগ সেরে ঢেকুর তুলতে তুলতে শিয়ালদহের রেলগাড়িতে গিয়ে চাপলেই হয়ে গেল।

পরনে ধবধবে পাজামা ও আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখে সোনালি চশমা পরমশৌখিন একজন জুতো মস-মস করে এসে কাউণ্টারের

চার্ট টেনে নিয়ে মনোযোগে দেখছে। মফস্বল-দলের একজন পাঁচ টাকার নোট বের করে দিল: এক টাকার টিকিট চারখানা—

কাউন্টার বলল, এক টাকার টিকিট হয় না। সাত সিকে সকলের নিচে।

শৌখিন লোকটি এদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, প্রেমাঞ্জনকে জানেন?

জানি বই কি। তাঁকে দেখতেই তো আসা।

এক টাকার টিকিট কেটে প্রেমাঞ্জন দেখা যায় না।

মানুষটা তর্ক করে: এক টাকা লাগেও না। ভাই আমার দশ আনার টিকিটে দেখে গেছে।

সে সিনেমার ছবি—মানুষ কক্ষনো নয়। মানুষ প্রেমাঞ্জন দেখতে হলে সর্বনিম্ন সাতসিকে—

বলে সে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল।

কাউন্টারের লোক জুড়ে দিল: সাত সিকের সিট পিছনে, একেবারে দেয়ালের ধারে। আগে-ভাগে বলে দেওয়া ভাল—চোখে-দেখা কানে-শোনা কোনটাই ভাল মতন হবে না।

ওদিক থেকে একজনে শুধায়: এই যিনি এসেছিলেন, কে বলুন তো মানুষটি? মনে লাগছে যেন—

মনে ঠিকই লেগেছে।

বলেন কি মশায়!

সিঁড়ির ঊর্ধ্বভাগে প্রেমাঞ্জনের গমনপথের দিকে মানুষটি সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল, বক্স-অফিসে প্রেমাঞ্জন—কী আশ্চর্য!

কাউন্টারের লোক বলে, বক্স-অফিস হল থিয়েটারের নাড়ি। এসে নাড়িটা দেখে গেলেন।

আর একজন বলে, খোঁচা দিয়ে শুনেও গেলেন, কার জন্যে লোকে মণিমঞ্চে আসে।

থিয়েটার দেখে যাবে হেমন্ত—কর্তামশার সত্যসুন্দর বলেকয়ে পাঠাচ্ছেন। এক নম্বর অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল বক্সে বসে দেখবে, মথুরানাথ করিডরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পায়ের উপর ধপ করে হঠাৎ প্রণাম। এদিকে ওদিকে মানুষজন সব তাকিয়ে পড়েছে। সবগুলো চোখের মণি ঠিকরে বেরুনোর যোগাড়। প্রণাম সেরে মাথা তুলতে হেমন্তও তাজ্জব। খুদ প্রেমাঞ্জন পদতলে। প্রেমাঞ্জনকে না জানে কে? চাক্ষুষ দেখেছে কিনা, হেমন্তর মনে পড়ছে না—সিনেমায় বহুত বহুত দেখা। এ হেন প্রেমাঞ্জন হাত বাড়িয়ে পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

একলা চলাচল প্রেমাঞ্জনের পক্ষে দুর্লভ। ইচ্ছা হলেও সাধ্য নেই—দুটো পাঁচটা ফ্যান আশেপাশে জুটবেই। তাদের কাছে হেমন্তর পরিচয় দিচ্ছে: আমার শিক্ষক। সামান্য যা-কিছু আমার শিক্ষা, এঁরই দয়ায়।

এক মান্যগণ্য ইস্কুলের হেমন্ত নগণ্য শিক্ষক। অনেক কাল ধরেই বিদ্যাদান চলছে। প্রেমাঞ্জন থিয়েটার-সিনেমায় দিকপাল—অবশ্যই হেমন্ত এই বিদ্যার পাঠ দিতে যায় নি। ইস্কুলের লেখাপড়া কী ঘোড়ার-ডিম করেছে, জানা নেই—সেই বস্তুর সবটুকুই নাকি হেমন্তর দয়ার দান। অজান্তে কতটা কি দান করে বসে আছে, বিস্তর ভেবেও হদিস পাচ্ছে না। ক্লাসে অবশ্য পঙ্গপালের মতন ছেলের ঝাঁক, কিন্তু প্রেমাঞ্জন তো ঝাঁকের মধ্যে বেমালুম হবার মতো নাম নয়।

সন্তর্পণে 'আপনি'-'তুমি'র ঝামেলা বাদ দিয়ে শুধাল: পড়াশুনো সাউথ এণ্ড হাই ইস্কুলে?

হ্যাঁ সার।

কিন্তু প্রেমাঞ্জন বলে কোন ছাত্রের নাম—মানে, নামটা কিছু নতুন ধরনের কিনা। ছেলেদের সঙ্গে বরাবর আমার মেলামেশাটা

কিছু বেশি।—ডিবেটিং-ক্লাব চালাই, ইস্কুল-ম্যাগাজিনের ভারও আমার উপরে। এইরকম নাম কখনো যে কানে গেছে—

প্রেমাঞ্জন হেসে বলে, আপনি কেন, আমার বাবার কানেও কখনো যায়নি। মারা গেছেন বাবা, আর তিনি শুনতে আসবেন না। মা বর্তমান আছেন, তিনি ইদানীং খুব শুনছেন।

কি নাম ছিল তখন ?—হেমন্তের প্রশ্ন।

এককড়ি। ছেলে হয়ে হয়ে মরে যেত—আঁতুড়ঘরে মা একটা কড়ির দামে ধাইয়ের কাছে আমায় বেচে দিলেন। বেঁচে রয়েছি আমি ধাইয়ের কপালে। মানে, বিধাতাকে ধাপ্পা দেওয়া—বিধাতা জেনে-বুঝে আছেন, ধাইয়ের সম্পত্তি আমি, গর্ভধারিণী মায়ের বিক্রি করে-দেওয়া মাল।

একচোট হেসে নিল প্রেমাঞ্জন। বলে, সিনেমা-থিয়েটারে এককড়ি অচল। এককড়ি নামের মানুষের অ্যাকটিং শুনতে কেউ টিকিট কিনে থিয়েটারে আসবে না। বিনি পয়সার পাস দিলেও তা-না না-না করবে। মনোলোভা নাম চাই—পেশার দায়ে এককড়ি হয়ে গেল প্রেমাঞ্জন। নাম কেমন হয়েছে সার ?

এত কথার পরেও হেমন্ত সন্দিগ্ধ চোখে আপাদমস্তক দেখে। প্রেমাঞ্জন বলে, মুখ-চেনাও ঠেকছে না—তাই না ? চেনা যাতে না হয়, ক্লাসে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই তো করতাম। ভাল ছেলে ছিলাম না, বুঝতেই পারছেন। 'বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো' না হলে থিয়েটার করতে আসে কেউ ? লেখাপড়া ছিল বাঘ। অর্ধেক দিন ক্লাস কামাই। হাজির হয়েছি তো সর্বশেষ বেঞ্চিতে সকলের পিছনে ঘাড় নিচু করে থাকতাম—কোন সারের সামনে না পড়ে যাই, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করতে পারেন। আপনার ডিবেটিং-ক্লাব যেখানে, সেই তল্লাটের ছায়া কোনদিন মাড়াইনি। আপনি আমায় চিনে ফেলবেন, সে রকম কাঁচাছেলে ছিলাম না আমি। তাই বলে আমি চিনব না কেন ? বই-টই লিখছেন, সে খবরও রাখি।

পয়লা ঘণ্টা দিল—ছ'টা বাজতে দশ মিনিট। থিয়েটারে তেমন আসা-যাওয়া নেই, হেমন্ত কিছু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রেমাঞ্জন বলে, দেখবেন বুঝি সার?

হ্যাঁ। একটু কাজে এসেছিলাম—তা সত্যসুন্দরবাবু বললেন, দেখেই যান নাটকটা।

প্রেমাঞ্জন মথুরাকে জিজ্ঞাসা করেঃ কর্তামশায় আছেন ঘরে?

মথুরা ঘাড় নেড়ে বলল, আছেন।

আর কেউ আছে?

মথুরা বলে, নতুনবাবু এইমাত্র এলেন। তাছাড়া পাশ নিতে এক-আধ জন আসছে, চলে যাচ্ছে।

প্রেমাঞ্জন বলে, সারকে বসিয়ে দিয়ে এসো মথুরা। আর হাবুলকে আমার নাম করে বলো, সর্বক্ষণ খবরাখবর নেবে, চা-লেমনেড দেবে। মস্তবড় মানুষ—থিয়েটারে এঁদের পাওয়া ভাগ্যের কথা। যত্নের ত্রুটি যেন না হয় কোনরকম।

স্বয়ং প্রেমাঞ্জন পদতলে মাথা রাখল, এবং এমনধারা খাতির জমাচ্ছে—এর পরেও কি মুখে বলতে হবে, মস্ত মানুষ। হেমন্তর দিকে সবাই ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছে। হতভম্ব হেমন্তই কেবল মালুম পায় না, সামান্য ইস্কুলমাস্টার কিসে অকস্মাৎ মস্ত মানুষ হয়ে পড়ল।

দ্রুত যাচ্ছিল প্রেমাঞ্জন, দু-এক পা গিয়ে থেমে পড়ে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নঃ সারের ঠিকানা কি আজকাল?

শহরে থেকেও সে এক মফস্বল জায়গা।—হেমন্ত সঙ্কোচ ভরে বলে, কুঠিঘাটা ছেড়ে বেশ খানিকটা গিয়ে পাঁচু মণ্ডল লেন—

প্রেমাঞ্জন আর বলতে দিল নাঃ বিনোদ সমাদ্দার—আমাদের বিনু-দা'ও তো ওইখানে থাকেন। যাব সার আপনার বাড়ি।

নিরস্ত করবার অভিপ্রায়ে হেমন্ত বলে, কাঁচা ড্রেন, ঘিঞ্জি গলি—গাড়ি ঢোকে না।

প্রেমাঞ্জন বলে, পায়ে হাঁটা ভুলে যাইনি সার। গাড়ি ক'দিন বা চড়ছি। আর, যে পেশা নিয়েছি—কতদিন চড়ে বেড়াব, তাই বা কে বলতে পারে। বিনু-দার সঙ্গে জানাশুনো নেই আপনার?

হেমন্ত বলে, তিনিই তো সত্যসুন্দরবাবুর কাছে নিয়ে এলেন।

তবে আর কি, বিনু-দাকে নিয়ে হঠাৎ একদিন গিয়ে পড়ব।

হেমন্তকে ছেড়ে প্রেমাঞ্জন কর্তার ঘরে চলল। হাবুল বেরিয়ে আসছে। প্রেমাঞ্জন বলে, আমার মাস্টারমশায় বক্সে বসেছেন। প্রোগ্রাম দিয়ে এসো। চা-টা যেন ঠিক মতো পান। ড্রপ পড়লেই তাঁর কাছে গিয়ে কী লাগে না-লাগে জিজ্ঞাসাবাদ কোরো।

হাবুলের দু-হাতে হাউস-ফুল লেখা দুই বোর্ড। নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে।

সহাস্যে প্রেমাঞ্জন বলে, টাঙাতে চললে? সব সিটে ঢেরা পড়ে গেছে—আমিও দেখে এলাম।

হাবুলও হাসতে হাসতে বলে, এর উপরে এক্সট্রা-চেয়ার পড়বে পাঁচ-সাতখানা। বিষ্যুদের প্লে-তেও পড়েছিল।

প্রেমাঞ্জন বলে, না পড়ে পারে! একখানা পাশ আমি চেয়েছিলাম, ম্যানেজার একজোড়া দিল। বলে, থিয়েটার একা-একা দেখে মজা পাওয়া যায় না। যিনি আসবেন, আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলবেন।

হাবুল দু-হাত উঁচু করে দেখায়ঃ ডবল বোর্ড ঝুলবে। কারও নজর না ফসকায়। একটা বক্স-অফিসের সামনে। আর একটা বাইরের গেটে—বড়রাস্তার উপর। জুবিলি থিয়েটারের লোকজন আসতে-যেতে দেখবে—দেখে বুক ধড়ফড় করবে তাদের।

আবার বলে, এক্ষুনি নয় তা বলে। বোর্ড ঝুলোব প্লে শুরু হবার পর। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

না টাঙিয়ে হাউস ফুল হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে

এখন। পাবলিসিটির অঙ্গ। সর্বজনে চেয়ে দেখুক, হাউস-ফুল হয়ে এলো বলে, নয়তো বোর্ড বের করেছে কেন ? পারঘাটায় খেয়ানৌকো নিয়ে যেমন করে। ছাড়ে নৌকো-ও-ও-ও—বলে মাঝি হাঁক পাড়ে, আর মাঝগাঙের দিকে নৌকো নিয়ে যায়। আবার ঘাটে ফিরিয়ে আনে। কিছু প্যাসেঞ্জার এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল— তাড়াতাড়ি নৌকোয় চড়ে বসে। অর্থাৎ এবারে না ছাড়লেও ছাড়ার বেশি দেরি নেই। এ-ও তেমনি : লাউঞ্জে গুলতানি করছে, থিয়েটার দেখার সত্যি ইচ্ছে থাকে তো এইবারে টিকিট কিনে তারা ঢুকে পড়বে।

মামা-ভাগনে, সত্যসুন্দর ও অমিয়শঙ্কর, পাশাপাশি দুই চেয়ারে ; নিম্নকণ্ঠে শলা-পরামর্শ হচ্ছিল। দরজা ঠেলে প্রেমাঞ্জন ঢুকে গেল। কর্তার ঘরে এমনি ঢোকা যায় না, স্লিপ পাঠাতে হয়। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, প্রেমাঞ্জনকে স্লিপের জন্য আটকাবে। টুপ করে বসে পড়ে কর্তার দিকে চেয়ে প্রেমাঞ্জন বলে, নাটকের তো নাভিশ্বাস উঠেছে।

সত্যসুন্দর নীরব। অমিয় কর-কর করে ওঠে : বুঝলেন কিসে ?

হাবুল দেখলাম হাউস-ফুল টাঙাতে চলল। একটা নয়, দু-হাতে দুই বোর্ড। মাঝ-সপ্তায় পর্যন্ত হাউস-ফুল হতে লেগেছে। এক্সট্রা-চেয়ারও দিতে হয়। এর পরে বুঝতে বাকি থাকবে কেন ?

অমিয় বলে, হাউস-ফুল যাচ্ছে, ভালই তো।

এত ভাল ভাল নয়—তাই না কর্তামশায় ?

সত্যসুন্দরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন। তিনি রা কাড়েন না— পাষাণমূর্তিবৎ বসে আছেন।

প্রেমাঞ্জন বলে, উঁকি দিয়ে চার্টটাও দেখে এসেছি। সব সিটে তখনই ঢেরা পড়ে গেছে

তবে ?

ঢেরা নীল পেন্সিলের। লাল-ঢেরা সিকিভাগও নয়।

অমিয় বলে, তফাতটা কি? পেন্সিলের দুটো মুখ – যখন যেটায় দাগ পড়ে যায়।

প্রেমাঞ্জন বলে, মামার কাছে এসেছেন বেশিদিন অবশ্য নয়, তাহলেও লাল-নীলের তফাত জানেন না এমন হতে পারে না। ভান করছেন। আমরা অভিনয় করি সবাই জানে, কিন্তু থিয়েটার-জগতে, খোদ-ম্যানেজার থেকে দেয়ালের টিকটিকি অবধি, কে যে অভিনেতা নয়, বলতে পারিনে।

কর্তামশায়ের দিকে সোজা মুখ ফিরিয়ে সরাসরি প্রশ্ন: 'জয়-পরাজয়' মুখ থুবড়েছে – নতুন নাটক কিছু ঠিকঠাক হল?

চমক খেয়ে সত্যসুন্দর বলেন, হলে জানতে পারবেন না? দাঁড় করাবেন তো আপনারাই। আপনাদের না শুনিয়ে মতামত না নিয়ে কেমন করে হবে?

প্রেমাঙ্কুর বলে, আমি যেটার কথা বলেছিলাম—নকুল ভদ্রের লেখা—

হুঁ—বলে সত্যসুন্দর ঘাড় নাড়লেন।

অমন জিনিস কালে-ভদ্রে ওতরায়। পাত্রপাত্রী স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র কথাগুলো বলে গেলেই নাটক জমে যাবে। পাণ্ডুলিপি শোনেন নি মোটে?

অমিয়শঙ্কর ফোড়ন কেটে ওঠে: না শুনে রেহাই আছে? ভদ্রমশায় তেমন পাত্রই নন।

সত্যসুন্দর ধমক দিয়ে উঠলেন: আঃ, এসব কি কথা! সকলকে নিয়ে আমাদের কাজ, সবাই আপনজন, সকলের আশীর্বাদ আছে বলেই মণিমঞ্চ এই বাজারে টিকে রয়েছে।

প্রেমাঞ্জন বলে, নকুলবাবু ডাঁটের উপর থাকেন বলে ভাল লিখেও তেমন কলকে পান না। আর 'জয়-পরাজয়ের' মতন রদ্দি মাল শিরোপা পেয়ে গেল জগন্ময় দাসের পা-চাটার গুণে।

সত্যসুন্দর বলেন, তখন কিন্তু মোটামুটি ভাল জিনিস বলে সবাই রায় দিয়েছিলেন।

আমি নই। রজত দত্ত একাই চেঁচিয়ে টেবিল ঘুসিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আপনাকে রাজি করালেন। করবেন না কেন, সারা বই জুড়েই তিনি। যেখানে একটু-আধটু খামতি ছিল, অথরকে দিয়ে ইচ্ছা মতন লিখিয়ে নিয়েছেন। তাই দেখুন, দত্তমশায় চলে গেলেন —নাটকও অমনি ধ্বসল। এত সব বড় বড় আর্টিস্ট মিলে চল্লিশটা নাইটও ধরে রাখা যাচ্ছে না।

অমিয় বলে, নাটক না লাগলেই তখন হাজার খুঁত বেরোয়। লেগে গেলে দোষও গুণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দেখেছি প্রেমাঞ্জনবাবু, অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছি। থিয়েটারে নতুন—কিন্তু বম্বে-মাদ্রাজ মিলিয়ে সিনেমা লাইনে আমার তো কম দিন হয় নি।

প্রেমাঞ্জন আগের সুরে নিজের কথাই বলে যাচ্ছে: নাটকে বস্তু না থাকলে শত চেষ্টাতেও কিছু হয় না। দেখুন না কেন, মাস মাস আমায় এতগুলো করে টাকা দিচ্ছেন—কাজ কতটুকু পাচ্ছেন বলুন তো? নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পড়ে প্রথম মুখ দেখাচ্ছি। তা-ও জুত মতো দুটো ডায়ালগ পাইনে—কি করব, কানা-চোখ হয়ে কপালের উপর ফজলি-আমের সাইজের আব বের করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরুই। লোকে তাই দেখে, আর তারিফ করে। পরের বইতে আমি এরকম সং সেজে বেরুতে পারব না, স্পষ্ট কথা।

দেয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে প্রেমাঞ্জন উঠল। অমিয় বলে, বসুন, কফি আনতে গেছে। আপনার তো সেই সেকেণ্ড অ্যাক্ট থেকে—বসুন একটু, এক্ষুনি এসে যাবে।

প্রেমাস্কুর বলে, চোখ উল্টে ঢেলা বের করতে হবে, প্যাড বসিয়ে আব বানাতে হবে—এ সবে অনেক সময় নেয়। কফি আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রেমাঞ্জন মস-মস করে গ্রীনরুমে চলল।

অমিয়শঙ্কর ফেটে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে : সং সাজতে পারবেন না—কানা চোখের মেক-আপ নিচ্ছেন, তাই সং সাজা হল। পাঠ ওঁর ফরমাশ মতো বানাতে হবে। কানা তো অনেক ভাল, নতুন নাটক নামাব আমি—রাবণ বধ। তাতে ওঁকে হনুমান সাজাব। হনুমান হয়ে সারা স্টেজে হুপ-হুপ করে লাফাবেন। না পারেন তো বাদ।

সত্যসুন্দর ভাগনেকে আবার ধমক দেন : আজেবাজে বকছ কেন? থিয়েটার জায়গা—দেয়ালেরও কান আছে।

থাকল তো বয়ে গেল। না মামা, এলাকাড়ি দিয়ে দিয়ে এদের সব মাথায় তুলেছ। যেন বিনি-মাইনেয় এসে দয়া করে যান। নাটক কি নেবো না-নেবো, আমাদের বিবেচনা। যাকে যে পাঠ দেব, তাই করতে হবে। কড়া ডিসিপ্লিন ছাড়া ব্যবসা চলবে না। থিয়েটারের সম্পর্কে যারাই আছে, সব নাকি অভিনেতা। তার মানে মিথ্যেবাদী আমরা সকলে। তুমিও বাদ নও মামা।

সত্যসুন্দর বলেন, যত যাই বলুক, খদ্দেরও এরাই টেনে আনে: যে গরু দুধ দেয়, খুরের চাটি তার খেতেই হবে।

দুধ তো ভারি—এ দুধে নব্বই পারসেণ্ট জল। নীল ঢেরা—মুফতের পাশই প্রায় সব। গোপনও নেই, সকলে জেনে গেছে: জোর করে হাউস-ফুল টাঙিয়ে কোন লাভ নেই।

আছে বইকি। শোন। যাদের হাতে নগদ গুঁজে দেওয়া যায় না, পাশ দিয়ে তাদের কিনে রাখি। তা ছাড়া, হল হা-হা করছে, সে অবস্থায় প্লেয়ারে মন বসিয়ে কাজ করতে পারে না, প্লে জমে না। খালি-হল বলে খরচা যে দুটো পয়সা কম হবে, তা-ও তো নয়।

অমিয় হেসে ফেলল : তোমার কথাটা দাঁড়াচ্ছে মামা—ট্রেন যখন কাশী অবধি যাচ্ছেই, সিট কেন খালি যাবে, বিনা টিকিটে নিয়ে গিয়ে মানুষকে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে দিই। আমার যে নতুন

নাটক হবে, মুফতের পাশ তাতে একেবারে বন্ধ। তা হলেও দেখো হাউস-ফুল নিত্যিদিন—সমস্ত লাল-পেন্সিলের ঢেরা।

নিচে হৈ-চৈ। উত্তাল হয়ে উঠল ক্রমশ। কথাবার্তা থামিয়ে সত্যসুন্দর উৎকর্ণ হলেন। ছ'টা বেজে গিয়ে আরো সাত মিনিট—কী আশ্চর্য, এখনো প্লে আরম্ভ হল না। অমিয়, গিয়ে দেখ তো একবার—

নিজেও বসে থাকতে পারেন না, খটাস করে কামরার দরজা খুলে বাইরে এলেন।

॥ চার ॥

হলে প্রচণ্ড হাততালি ও চেঁচামেচি। সামনের পর্দা যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে। নড়ার লক্ষণ নেই। মফস্বলের দলটার উপর তখন কাউণ্টার দাবড়ি দিয়েছিল, সিট ছেড়ে বাইরে এসে তারা এবারে ঘিরে ধরেছে: কি গো মশায়, ঘড়িতে কখন ছ'টা বেজে গেছে। আপনাদের ছয় ক'টার সময় বাজবে? খাঁটি-খাঁটি বলুন।

বেরিয়ে পড়ে সত্যসুন্দর পায়ে পায়ে সিঁড়ি অবধি এসেছেন, ভৃত্য ন্যাড়া ছুটতে ছুটতে এল: নতুনবাবু পাঠালেন। আপনাকেই যেতে হবে, নয়তো হচ্ছে না।

স্টেজের ছোট্ট দরজার মুখে ম্যানেজার। সত্যসুন্দর শুধালেন: কি ব্যাপার, সাড়ে-ছ'টা বাজতে যায়—ড্রপ ওঠে না কেন এখনো?

ম্যানেজার তিক্ত কণ্ঠে বলে, আমি কি করব, ভিতরে গিয়ে দেখুন।

পর্দার বাইরে হলের মধ্যে তুমুল হে-চৈ, এদিকে ভিতরে স্টেজের উপর এমন নিঃশব্দতা যে সুঁচটা পড়ে গেলেও বোধকরি শব্দ কানে এসে পৌঁছবে। মেক-আপ নিয়ে আর্টিস্টরা উইংসের কাছে লুকিয়ে আছে, ড্রপ উঠলেই পলকে নেমে পড়বে। এখন নির্বাক নিশ্চল স্থিরচিত্রের মতন। প্রম্পটারকে সত্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন: ব্যাপার কি বাণীকণ্ঠ?

বাণীকণ্ঠ চুপিসাড়ে বলল, ঘোষালমশায় বিগড়ে আছেন। গোড়াতেই তাঁর কাজ। নতুনবাবু কত করে বললেন, তা কানে নিচ্ছেন না।

নাট্যজগতে বাঘা-আর্টিস্ট যাঁদের বলে, শঙ্কর ঘোষাল তাঁদের একটি। পাঠ নিয়ে কোনরকম বায়নাক্কা নেই—রাজা সাজা থেকে তামাক সাজা, স্টেজের উপর যা করতে বলবে তাতেই রাজি। এবং সাতিশয় অধ্যবসায়ী—যে পাঠই করুন নিশ্চয় তা উতরে দেবেন,

তেমনটি আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না। আরও একটা গুণ, সময় নিয়ে সদাসতর্ক, আধ মিনিটও কখনো এদিক-ওদিক হয় না। আবার কাজ অন্তে বসে বসে ফষ্টি-নষ্টি করবেন, তা-ও নয়। এইসব কারণে উপরওয়ালা কর্তাদের খুব পছন্দ। কিন্তু হলে কি হবে, পয়সাকড়ির ব্যাপারে পয়লানম্বুরি চশমখোর—চুক্তির পাই-পয়সাটি অবধি আদায় করে ছাড়েন। সিনেমা-থিয়েটার, কে না জানে, মায়ার জগৎ। কত কি দেখাচ্ছে-শোনাচ্ছে—আসলে অলীক সব। এখানকার মুখের প্রতিশ্রুতি এবং লিখিত কণ্ট্রাক্টও খানিকটা তাই। ব্যতিক্রম শুধু শঙ্কর ঘোষালের ক্ষেত্রে। লাইনে বিশ বছর আছেন, পাওনা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছেন, একটি পয়সা কেউ মারতে পারেনি। সকলের মাসমাইনে, শঙ্কর ঘোষালের বেলা দিনের রোজ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে হয়। বলেন, একসঙ্গে গুচ্ছের টাকা দিতে বুক চড়-চড় করবে—কী দরকার, কাজ হয়ে গেলে চল্লিশটা টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবেন, গায়ে লাগবে না। দিতে হয় তাই। অন্তরালে কটুকাটব্য : অর্থপিশাচ মানুষটা আর্টিস্ট না হয়ে চোটার কারবারে গেল না কেন ?

ঘোষাল বিগড়েছেন, কর্তামশায় ছুটে তাঁর ঘরে গিয়ে পড়লেন। পর্দা উঠলেই অরণ্যের সিন। শঙ্করের ব্রিচেস-পরা শিকারীর বেশ। মেক-আপ চমৎকার নিয়েছেন—যৎসামান্য কাজ বাকি। আণ্ডারওয়্যারের উপর ব্রিচেস আলগা ভাবে রয়েছে—টেনে-কষে বোতামগুলো আঁটলেই হয়ে যায়। সেইটুকু করছেন না শঙ্কর—আয়নায় দেখে মুখের উপর ঈষৎ পাফ বুলোচ্ছেন। বোদে চক্কোত্তি অন্তরঙ্গ ও আজ্ঞাবহ—সে আছে, আরও দু-তিনটি আছে। তাদের সঙ্গে একটু-আধটু হাসি-মস্করাও করছেন।

সত্যসুন্দর ব্যাকুল হয়ে বললেন, পর্দা ওঠে না কেন ?

শঙ্কর ঘোষাল উদাসভাবে বললেন, ওঠালেই হয়। বাধা তো কিছু নেই।

আপনি তবে উঠে পড়ুন—

কেন উঠব না? উঠবার জন্যেই তো সাজগোজ নিয়ে আছি। বলে শঙ্কর কর্তামশায়ের দিকে হাত বাড়ালেন: টাকাটা দিয়ে দিন।

সত্যসুন্দর বলেন, যাবার সময় নিয়ে যাবেন।

তাই তো নিয়ে থাকি। কিন্তু বিষ্যুদের টাকা অর্ধেকের বেশি তো দিতে পারলেন না—

চটে-মটে সত্যসুন্দর বলেন, ঐ কুড়ি টাকা না দিয়ে কি পালিয়ে যাব? বিক্রি আজ খারাপ নয়—হল গম-গম করছে। লোকে বিরক্ত হচ্ছে, সিনটা করে দিয়ে আসুন। ততক্ষণে আমি বক্স-অফিস থেকে টাকা এনে রাখছি।

শঙ্করের কিছুমাত্র চাড় দেখা যায় না। বলেন, এনেই দিন না মশাই। আজকের চল্লিশ আর বিষ্যুদের কুড়ি—একুনে ষাট। ঝঞ্ঝাট চুকেবুকে যাক।

টাকা হাতে নগদ নগদ না পেলে নামবেন না আপনি—পনেরো বিশ মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারেন না? এই সিনেই যে শেষ হয়ে গেল, তা নয়। পরেও আপনার যথেষ্ট কাজ।

খুব যেন একটা কৌতুকের ব্যাপার, তেমনিধারা অমায়িক-হাসির সঙ্গে শঙ্কর বললেন, যতক্ষণ এই কথাবার্তা হচ্ছে, তার মধ্যেই কিন্তু বক্স-অফিস থেকে টাকা আনা হয়ে যেত কর্তামশায়।

আচ্ছা—।

গজরাতে গজরাতে সত্যসুন্দর ছুটলেন। টিকিট বিক্রির দরুন খুচরো টাকা অনেক—এক টাকার নোট দু হাতে মুঠো করে এনে ছুঁড়ে দিলেন শঙ্করের টেবিলের উপর। ছড়িয়ে পড়ল, মেঝেতেও পড়ে গেল খান কয়েক। শঙ্করের কিছুমাত্র দৃকপাত নেই। মেঝের গুলো কুড়িয়ে তুললেন। সমস্ত গুণেগেঁথে—হ্যাঁ, পুরোপুরি ষাটই বটে—পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে শঙ্কর ঘোষাল

ভিন্ন এক মানুষ। পটাপট ব্রিচেসের বোতাম এঁটে কোমরে বেল্ট কষে লম্ফ দিয়ে উঠে পড়লেন। তীরের বেগে স্টেজে গিয়ে আদেশ: ঘণ্টা মারো, পর্দা তোল। যার যেমন কাজ, গিয়ে দাঁড়াও—

সত্যসুন্দর নিশ্চিন্তে ঘরে চললেন। আর দেখতে হবে না অভিনয় এখন গড়-গড় করে চলবে। শঙ্কর ঘোষালের যতক্ষণের কাজ—তার মধ্যে ভূমিকম্পে যদি বাড়ি ধ্বসে পড়ে অথবা গঙ্গার প্লাবন এসে অডিটোরিয়াম ভাসিয়ে দেয়, অভিনয় তবু সমানে চলবে।

অমিয়শঙ্কর আগেই চলে এসেছে। রাগে ফুঁসছিল। কর্তামশায়কে পেয়ে বোমার মতন ফেটে পড়ল: আমার নতুন নাটকে শঙ্কর ঘোষালও বাদ। লোকটা আর্টিস্ট নয়, চামার।

সত্যসুন্দর ধীরকণ্ঠে বললেন, ঘোষালমশায় বাদ হয়ে গেলেন। রজত দত্ত ইহলোকই ছেড়েছেন, প্রেমাঞ্জনকে ঘোর অপছন্দ—কাকে নিয়ে চলবে তোমার নাটক ?

নতুনরা সুযোগ পাবে। কোনো বায়নাক্কা নেই তাদের, স্টেজে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পেলেই বর্তে যায়।

সত্যসুন্দর বলেন, খদ্দের টানতে পারবে ?

খদ্দের নাটকের টানে আসবে, আর্টিস্টের নামে নয়। বড় বড় করে নাম ছেপে কয়েকটার লেজ ফুলিয়ে দিয়েছ—থিয়েটার-সিনেমায় তাদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া। কোন আর্টিস্টের নামই দেব না আমার নাটকের পোস্টারে।

কী জানি, কেমন হবে!—কর্তামশায়ের ইতস্তত ভাব।

অমিয় বলে, নাটকে লেখকও তোমাদের বাঁধা—সাকুল্যে পাঁচটি সাতটির বেশি হবে না। ফরমাশ মতন তাঁরা থিয়েটারে থিয়েটারে নাটক যুগিয়ে বেড়ান।

সত্যসুন্দর বলেন, কাজের সুবিধা হয়। থিয়েটার ঘুরে ঘুরে ঘাঁতঘোঁত জেনে-বুঝে আছেন, কাকে দিয়ে কোন জিনিস কতখানি ওতরাবে নখদর্পণে ওঁদের।

অমিয় বলে, আর্টিস্টের মুখ চেয়ে নাটক বানালে কি সর্বনাশ হয়, হালফিল তোমার চেয়ে কে বেশি জানে মামা? এত তোড়জোড় করে 'জয়-পরাজয়' নামালে—রজত দত্ত মারা গেলেন, নাটকেরও সঙ্গে সঙ্গে বারোটা বাজল। প্রেমাঞ্জন, শঙ্কর ঘোষাল, পঙ্কজিনী এতসব আর্টিস্ট মিলেও ধরে রাখতে পারছেন না। এবারে প্রেমাঞ্জন নকুল ভদ্রের নাটক নামানোর জন্য লেগেছেন। নকুল প্রেমাঞ্জনের লোক—নাটকে অন্যদের ছেড়ে ওঁকেই সে ঠেকনো দিয়ে আকাশে তুলবে। ঠারে-ঠোরে নাকি বলেছেনও, ঠিকমতন পাঠ না পেলে নকুল ভদ্রের বই নিয়ে তিনি জুবিলির সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করবেন। কিন্তু শাসানিতে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। উঁকিঝুঁকির আনাচে-কানাচে মেলা নটনটী নাট্যকার-গীতিকার ঘুরে বেড়ায়। বিনু-দাকে ধরলাম, বেছেগুছে নাট্যকার একটা দিন—ঝুনো-ঝানু নয়, হাত পাকাচ্ছে এমনি আনকোরা মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে উনি হেমন্ত করের কথা বললেন। ওঁর খুব আপন। হেমন্তবাবুর নাটকের আইডিয়াও বিনু-দার। গতানুগতিক নয়—অবিশ্যি আগাপাস্তলা ভাল করে ঝাড়াই-বাছাই করতে হবে।

কথাবার্তার মাঝে ম্যানেজার হরপদ ভারি-সারি এক লেফাপা সহ হাজির।

কাগজের অফিস থেকে? আস্ত গন্ধমাদন যে!—হাত বাড়িয়ে অমিয় নিয়ে নিল। টেবিলের ছুরিটা নিয়ে লেফাপার মুখ কাটে। একগাদা আঁটা খাম।

ওরে বাবা!—ভয়ের ভান করে অমিয় তাকায়। দু-চারটে খাম ছিঁড়েও ফেলল। ভিতরে যথারীতি সুন্দরীর ফোটো ও বিবিধ গুণাবলীর তালিকা।

অমিয় বলে, পরশু এসেছিল, কাল এসেছিল, আজকে আবার এই গাদা। আরও কত আসবে না জানি!

সত্যসুন্দর আরও ভয় পাইয়ে দেন: হপ্তা ভোর আসবে—হয়েছে কি এখনো। দরখাস্ত আর ফোটোগ্রাফের পাহাড় জমে যাবে।

তুমি মামা কিন্তু উল্টোকথা বলেছিলে: মিছে অর্থব্যয়—কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে ভালঘরের মেয়েছেলে একটাও সাড়া দেবে না।

সত্যসুন্দর বলেন, তাই তো জানতাম। হেন কাণ্ড আমাদের বয়সে কোনদিন কেউ স্বপ্নে ভাবে নি। দুটো-পাঁচটা মেয়ে গৃহস্থ-বাড়ি থেকে আসেনি যে তা নয়—ভাঁড়ে মা-ভবানী, মুখে অথচ প্রগতি কপচে বেড়ায়, এমনিধারা কয়েকটি। এ যে দেখা যাচ্ছে পঙ্গপালের ঝাঁক। মেয়ে-বউরা ফোটো তুলে সেজেগুজে ঘরে ঘরে তৈরি, বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-পুত্তুরে রুচি নেই—ডাকটা পেলেই তোমার নতুন নাটকের নটী হয়ে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আরও আগে—একেবারে আদি-আমলের গল্প। ঠিক হল, থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্র স্ত্রীলোক দিয়েই করানো হবে। কিন্তু খানিকটা সুদর্শনা এবং নাটক করতে রাজি—এমন আর মেলে না। থিয়েটারের দালাল খারাপ-পাড়াগুলো চষে ফেলছে: দেহ-বিক্রি কেন আর মা-লক্ষ্মীরা? সৎপথে থেকেই রুজি-রোজগার—সেইসঙ্গে নাম-যশ, কাগজে কাগজে লিখবে তোমার নামে, ছবি বেরুবে—

নাম-যশ কি ধুয়ে খাব বাবুমশায়? দেহখানা জখম হয়ে গেলে কেউ তখন পুঁছবে না—যে লাইনে করে খাচ্ছি সেখানে যেমন, আপনাদের থিয়েটার-লাইনেও তেমনি। (ঠিকই বলেছিল, তাই না? আমাদের তারামণিকে দেখ।) নিজের ঘরে শুয়ে বসেই দুনো রোজগার, হাটের মাঝে তবে আর নাচতে কুঁদতে যাব কেন?

তখনকার কথা এইরকম। ধরে পেড়ে অনেক কষ্টে এক একটা জুটিয়ে আনতে হত। আর এখন? কাগজে মাত্র দু-লাইনের বিজ্ঞাপন: নতুন নাটকের জন্য যথার্থ সুন্দরী তরুণী নায়িকা চাই।

অমুক বক্স-নম্বরে ফোটো সহ নাম-ধাম-বিবরণ—। ব্যস, বাঁধ ভাঙল। বন্যা। হু-হু শব্দে চিঠির স্রোত। মণিমঞ্চ ডুবিয়ে দেবে।

অমিয় বলে, বিজ্ঞাপনে কি রকম চোখা চোখা কথা লাগিয়েছি, তা-ও দেখেছ তোমরা। সুন্দরী চাই—যেমন তেমন হলে হবে না, সত্যিকার সুন্দরী। সেই সুন্দরী আবার তরুণীও হবে একাধারে। ইচ্ছে করেই বাঁধন-কষন—উমেদারনী কম হবে ভেবেছিলাম। ওরে বাবা, সুন্দরীর ঠ্যালায় এখন যে চোখে অন্ধকার দেখছি।

ম্যানেজার হরপদ অমিয়র প্রায় সমবয়সী। সে মুখ খুলল: আহা, দেশের কী সুদিন! সুন্দরীতে সুন্দরীতে ছয়লাপ—

ফোটোর সঙ্গে গুণের বিবরণ এসেছে—একটা দুটোয় চোখ বুলিয়ে অমিয় বলে উঠল, সুন্দরী কি যেমন তেমন! উর্বশী রম্ভা তিলোত্তমা, নয় তো পদ্মিনী নুরজাহান ক্লিওপেট্রা—তার চেয়ে কম কেউ যাবে না। বিউটি কমপিটিসানে রকমারি প্রাইজ কব্জা করেছে নাকি—লম্বা লম্বা ফিরিস্তি।

আর তরুণী চেয়েছিলেন—হরপদ একটা ফোটো টেবিলের মাঝামাঝি ঠেলে দিল: তরুণীর নমুনা দেখুন কর্তামশায়।

সেদিকে চোখ তাকিয়ে অমিয়শঙ্কর বলে, তরুণী ছিল বটে একদিন, মিছেকথা নয়, সেটা বছর পঁচিশেক আগে।

মৃদু হেসে সত্যসুন্দর বললেন, সামনাসামনি দেখ, মনে হবে তরুণীই। স্টেজের উপরে তো স্বচ্ছন্দে চালানো যাবে। জবর জবর কসমেটিক বেরিয়েছে, পঁচিশ-তিরিশ বছর চুরি মেয়েরা তো আখচার করে থাকে, সাদা-চোখে কার সাধ্য ধরে! ক্যামেরায় বজ্জাতি ধরতে পারে নি, তাহলে এ ছবি পাঠাত না।

হেমন্ত মগ্ন হয়ে থিয়েটার দেখছে। মস্তমানুষ বলে প্রেমাঞ্জন পরিচয় দিল, নিজেরও সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পদে পদে মালুম হচ্ছে, ঘোরতর মস্তমানুষ সে। মথুরানাথ পরম যত্নে

পয়লানম্বুরি বক্সে বসিয়ে দিয়ে গেল। পিঠ পিঠ ছাপা-প্রোগ্রাম নিয়ে হাবুলের আবির্ভাব। পিছনে গরম চা সহ পুনশ্চ মথুরানাথ, এবং সামান্য পরেই ঠাণ্ডা ঘোলের শরবৎ সহ ন্যাড়া। শরবতে চুমুকের মধ্যেই পর্দা উঠে গিয়ে অরণ্যের সিন—শঙ্কর ঘোষাল শিকারী বেশে তুড়িলাফ দিয়ে স্টেজে পড়লেন। পান-টান এই-সময়ে নিয়ে এলে রসগ্রহণে বাধা পড়ে—তাই যেন লুকিয়ে ছিল হাবুল, প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়তে না পড়তে পানের দোনা ও সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত। সঙ্গে রেস্তোরাঁর বয়, ট্রে-তে করে চা কেক এনেছে—এবং হুকুম মাত্রেই এক-ছুটে গরমাগরম কবিরাজি-কাটলেট এনে দেবে, সেজন্য সাধাসাধি করছে। হলের মধ্যে ধুমপান নিষেধ বলে কষ্ট করে গাত্রোত্থান করে ছু-পা দূরের ঐ করিডরে গিয়ে সিগারেট ধরাতে হবে, হাবুল সবিনয়ে বলছে—

এমনি সময় গটমট করে, অন্য কেউ নয়, স্বয়ং অমিয়শঙ্কর। বলে, চা-টা পাচ্ছেন তো ঠিক? পাশের চেয়ার নিয়ে গা ঘেঁষে সে বসল। হাবুলকে বলে, আজকে আবার একগাদা—খবরের কাগজ থেকে এইমাত্র দিয়ে গেল। তাই খানিক নাড়াচাড়া করছিলাম—ম্যানেজার এখন ঘরে নিয়ে গিয়ে বাছাবাছি করছে। একলা মানুষের সাধ্য কি! তুমিও যাও হাবুল, মিলেমিশে অপ্সরী-কিন্নরী বাছো গে। আমার জন্যে পনেরো-বিশ খানার বেশি রেখো না, তার ভিতর থেকে ফাইন্যাল করব।

হাবুল তৎক্ষণাৎ বেরুল। সুন্দরী তরুণী উমেদারনীদের ফোটোগ্রাফ ও আত্মকথা—এ জিনিসে ভারি উৎসাহ তার।

হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, পটে চা রয়েছে। আর একটা কাপ পাওয়া গেলে—

অমিয় নিরস্ত করে: একটু আগেই কফি খেয়েছি। এখন আর খাব না। তারপর হাসতে হাসতে বলে, প্রেমাঞ্জনবাবু পায়ের ধুলো-টুলো নিলেন তো খুব—

সামান্য ব্যাপারটুকুও কানে গিয়ে উঠেছে—আশ্চর্য তো! হেমন্ত বলল, আমার ছাত্র।

আপনার ছাত্র একটি জিনিয়াস। আবার অত্যধিক বিনয়ী—এই তো দেখলেন। পায়ের ধুলো নেওয়া অতীতে কি হয়েছে কখনো, না এই প্রথম?

কথার ধরনটা ভাল না। তবু আমল না দিয়ে হেমন্ত বলে, দেখাই হয় নি এতদিন।

ভাগ্যিস হয় নি। হলে চিনতে পারতেন না। আর আজ যদি এভারেস্টের চূড়োয় গিয়ে বসেন, খুঁজে সেখানে গিয়ে পদধূলি নেবেন। কেন বলুন তো?

জবাব চায় না অমিয়, সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য: থিয়েটার দেখতে বসা কিন্তু উচিত হয় নি হেমন্তবাবু। যাচ্ছে কোথা—নাটক আপনার সুভালাভালি লেগে যাক, থিয়েটার কত দেখবেন।

কথাগুলো মোটেই ভাল না। হেমন্তই যেন মাথা-ভাঙাভাঙি করে এসেছে! ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বলল, কর্তামশায় হাতের মধ্যে পাশ গুঁজে দিলেন। বললেন, নাট্যকার হতে হলে হর-হামেশা থিয়েটার দেখতে হবে। সব দিনের কাজ এক রকমের হয় না—সেজন্য একই নাটক দেখতে হবে পাঁচ-সাত বার করে। দেখতে দেখতে বুঝে ফেলবেন, কোন প্লেয়ার দিয়ে কি রকমের কাজ আদায় হতে পারে। খদ্দেরে কি জিনিস চায়, অডিটোরিয়ামের হাততালি আর ভাবগতিক দেখে তা-ও বুঝবেন। এত সমস্ত কথার পরে আমি কি করতে পারি বলুন?

বেজার মুখে অমিয় বলল, মামাই ডোবাবেন, বুঝতে পারছি। দু-পুরুষ ধরে এক নিয়মে কাজ করে এসে এখন তার বাইরে যেতে কিছুতেই ভরসা পান না। যত ঘুঘু নিয়ে আমাদের কাজ-কারবার —নাট্যকার বলে আপনাকে সন্দেহ করেছে, কানাঘুসো শুরু হয়ে গেছে। সামাল, খুব সামাল। আপনি কিন্তু মশায়, কাঠবোবা

আর বদ্ধকালা। নাটক নিয়ে কিছু বললেই হুঁ-হাঁ করতে করতে সরে পড়বেন সরাসরি আপনার সেই পাঁচু মণ্ডল লেন অবধি।

বেল বাজল। দ্বিতীয় অঙ্ক এইবার। ড্রপ উঠে গেল। মানুষজন হুড়মুড় করে ঢুকছে। নিচে হলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অমিয়শঙ্কর বলে, 'বি' সারির ষোল নম্বর সিটে তাকান। প্রথম অঙ্কে খালি ছিল। এইবারে এসেছে।

কোনটা ষোল নম্বর, বাইরের মানুষ হেমন্ত কেমন করে বুঝবে? অমিয় হেসে বলে, আঙুল দেখাতে পারব না—পেত্নী-শাঁকচুন্নীদের আঙুল দেখাতে নেই। পয়লা সারি হল 'এ'—তার পিছনের সারি 'বি'। মাঝামাঝি যে প্যাসেজ, তার দক্ষিণে ষোল নম্বর। ষোল আর তার পাশে সতের—দুটোই এতক্ষণ খালি পড়ে ছিল। সতের এখনও খালি—এই ছাড়া খালি সিট আর কোথাও নেই।

বুঝে নিল হেমন্ত, ষোল নম্বরে আসীন পেত্নীকেও দেখল। অমিয় বলে, দেখতে পাচ্ছেন?

হেমন্ত বলে, সাজগোজওয়ালা দস্তুরমতো সুন্দরী পেত্নী—

নাম জয়ন্তী মিত্তির—থিয়েটারের ঝাড়ুদারটা অবধি জানে।

হেমন্তর মনে পড়ে গেল। বলে, জানি আমিও। একদিন উঁকিঝুঁকি অফিসে এসেছিলেন বিনুদার কাছে।

অমিয় বলে যাচ্ছে, 'জয়-পরাজয়' নাটকের আজ আটত্রিশ রাত্রি। ও-মেয়ের এর মধ্যে বিশ-পঁচিশ বার দেখা হয়ে গেছে।

হেমন্ত সবিস্ময়ে বলে, বলেন কি?

সিটও নেবে সামনের দিকে—চার-পাঁচ সারির মধ্যেই।

হেমন্ত বলে, এতবার দেখতে ভাল লাগে? একঘেয়ে হয়ে যায় না?

অমিয়শঙ্কর বলে, জয়ন্তী মিত্তির নাটক দেখে না, প্রেমাঞ্জন দেখে। পঁচিশ কেন, পাঁচশো রাত্রি হলেও আশ মিটত না। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রেমাঞ্জনের প্রথম প্রবেশ। জয়ন্তীর সিট প্রথম অঙ্কে বরাবরই

খালি পড়ে থাকে। উদ্দেশ্যটা সেই জন্যে আরও বেশি নজরে পড়ে যায়।

হুম করে অমিয় আর এক খবর দিল: প্রেমাঞ্জনের স্ত্রীও এসেছেন।

দারুণ কৌতূহলে হেমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল: কোথায়—কোন জন তিনি?

নজরে আসবে না। সকলের পিছনে দেয়াল-ঘেঁষা ঐ যে কয়েকটা সিট, ওখানে?

পিছনে কেন?

অমিয় তিক্তকণ্ঠে বলে, বুঝুন তাই। পাশ তো আজকাল দু-হাতে ছড়ানো হচ্ছে। জয়ন্তী মিত্তিরও পাশে এসেছে, প্রেমাঞ্জন পাশ নিয়ে গিয়েছিল। ওর নিজের বউ কিন্তু কখনো পাশে আসেন না। থিয়েটার থাকলেই এ-পাড়ায় আসেন, শুনতে পাই। হলে ঢোকেন কদাচিৎ। পিছন দিককার ঐ কয়েকটা সিট প্রায় খালিই থাকে—ঢোকবার ইচ্ছে হলে টিকিট কেটে ওরই একটায় বসেন।

হেমন্ত বলে, শোনা যায় কিছু ওখান থেকে? ভাল দেখাও বোধহয় যায় না।

প্লে দেখতে রেখা দেবীও আসেন না। খুশি মতন আসেন, খুশি মতন বেরিয়ে যান। মাথা খারাপ—এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন না। কী জানি, জয়ন্তী মিত্তিরকেই হয়তো দেখে যান একনজর।

ছাত্রের স্ত্রী পাগল শুনে হেমন্ত চুক-চুক করে: আহা!

অমিয় উত্তেজিত হয়ে উঠল: অথচ প্রেমের বিয়ে—তাই নিয়ে কত রকম কাণ্ড-বাণ্ড! পরের নাটক লিখুন না প্রেমাঞ্জনকে নিয়ে —আমি মালমসলা দিতে পারি। আমি কেন—বিনুদার সঙ্গে আপনার ভাব, তিনি নাড়িনক্ষত্র জানেন জয়ন্তী প্রেমাঞ্জন দুটোরই। দেখুন, আপনার ঐ ছাত্র আস্ত স্কাউণ্ড্রেল একটি। নাটক লিখুন, আমি অভিনয় করাব, খুব জমবে।

পাঁচ

রজত দত্ত জাতশিল্পী। জীবনভোর কেবল থিয়েটারই করলেন—সিনেমা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন, তাক লাগিয়ে বোকা লোকের পকেট-কাটার ফন্দি। দু-জনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে—এইটুকু বানাতেই নিদেন পক্ষে দশটা টুকরো জুড়বে—কোনটার ছবি আজ তুলল, কোনটা বা একমাস পরে। অভিনয়ের তাতে ছন্দোপাত ঘটে, খাঁটি জিনিস ওতরায় না। লম্বা-চওড়া ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ, মধুক্ষরা কণ্ঠ, অভিনয়-কালে প্রতিটি অঙ্গ যেন সশব্দে কথা কইত। মুখ একেবারে বন্ধ করে থাকলেও বক্তব্য বুঝতে আটকায় না—এমনি ছিলেন রজত দত্ত।

'জয়-পরাজয়' রজতের বড় পছন্দের নাটক। নাট্যকার জগন্ময় দাস কাঠামো গড়ে দিলেন, তার উপরে তাঁর রকমারি কারুকর্ম—অনেক চিন্তাভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। সত্যসুন্দরও টাকা ঢালতে কৃপণতা করেন নি। লেগে যেত নির্ঘাৎ, পাঁচটা অভিনয়ের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বিধাতা বিমুখ—পঞ্চম রাত্রে অভিনয় সেরে রজত বাড়ি গিয়ে যথারীতি শুয়ে পড়লেন। ভোরবেলা বুকে যন্ত্রণা—অবশেষে অচেতন। অ্যাম্বুলেন্স এল, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনো অবধি সবুর সইল না—পথের মধ্যেই শেষ।

আর্টিস্ট রজত স্টেজের উপরে কালও মহাধনী উচ্ছৃঙ্খল হিরণ্য চৌধুরি সেজে টাকাকড়ি দু-হাতে খোলামকুচির মতন ছড়িয়ে এসেছেন, সেই মানুষটি চোখ বোঁজার পর আজকে তাঁর নিজস্ব ক্যাশবাক্স কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সর্বসাকুল্যে পাওয়া গেল তিনটাকা বারো পয়সা—তাতে ঠ্যাং মুড়ে চিতায় তোলাও খরচে কুলিয়ে ওঠে না।

কাজ অবশ্য আটকে রইল না—সত্যসুন্দর এসে পড়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যাবতীয় বন্দোবস্ত করলেন। এবং রজতের বিধবাকে কথা দিয়ে গেলেন, ছেলে প্রণব যদি চায়, তাকে থিয়েটারে নিয়ে নেবেন। এসব না-হয় হল—কিন্তু এত নামযশ, ভক্তবৃন্দ বলত নাট্যজগতের শাহানশা তিনি, সেই মানুষটির ট্যাঁকের অবস্থাও এই প্রকার। কারণ জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, অভিনয়ে সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধিলাভ —তুচ্ছ অশনবসনের সমস্যা কোনদিন রজত দত্তের মাথায় ঢোকেনি। জীবনের সর্বশেষ সেই অভিনয়টাও উতরেছিল অতি চমৎকার, হাততালির চোটে অডিটোরিয়াম ফেটে পড়ছিল। রজত বাড়ি রওনা হলেন, আবিষ্ট ভাব কাটেনি তখনো। অফিস থেকে মাইনেটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, রোজই ভুলে যান। আজকে বউ বিশেষ করে বলে দিয়েছিল, যাওয়া মাত্রেই সে হাত পাতল। জিভ কাটলেন রজত: এইরেঃ! বউ শাসাচ্ছে: চাল বাড়ন্ত, ঘরে একটি দানা নেই। রজত দত্ত বিশেষ বিচলিত নন। বললেন, নেই বুঝি? ভাতে-ভাত করো তবে। নিরন্নের ঘরের বহুপ্রচলিত রসিকতা। বলে তিনি হো-হো করে প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠলেন। আর্ট বুঝতেন রজত, আখের বুঝতেন না।

শঙ্কর ঘোষাল যে কাণ্ডটি আজ করেছেন, পাশাপাশি রজত দত্তের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। তুললেন শঙ্কর নিজেই—গ্রীনরুমের মধ্যে শঙ্করের নিজস্ব খোপ, সেইখানে। প্রথম অঙ্কের শেষে ইণ্টারভ্যাল চলছে তখন। এর পরের সিনে শঙ্করের কাজ নেই। আর রজতের ছেলে প্রণব তো নতুন ঢুকেছে—তার খুব ছোট পার্ট, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দিকটায় মিনিট কয়েকের জন্য স্টেজে মুখ দেখিয়ে আসবে, তারপর তৃতীয় অঙ্কে। শঙ্করের সঙ্গে রজত দত্তের খুব ভাবসাব ছিল —সেই সুবাদে শঙ্কর প্রণবের কাকাবাবু। কাকাবাবুর কাছে প্রায়ই এসে সে অভিনয়ের এটা-ওটা জেনে নেয়।

আজকে এসে দরজাটা সন্তর্পণে সে ভেজিয়ে দিল। শঙ্কর নিজেই

কথাটা তুললেন : যে সিনটা আমি আজ করলাম, তোমার বাবা মরে গেলেও তা পারতেন না। অসাধ্য ছিল তাঁর পক্ষে। আশ্চর্য অভিনয়-বোদ্ধা, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি একেবারে ছিল না। ফল প্রত্যক্ষ। অতবড় আর্টিস্ট মারা গেলেন, বাক্স হাতড়ে পুরো পাঁচটা টাকাও মিলল না।

প্রণব বলে, কর্তামশায় নাকি দুঃখ করছিলেন—

শেষ করতে না দিয়ে শঙ্কর গড় গড় করে বলে যান : ঘোষাল মশায় শিল্পীমানুষ—কত বড় সম্মানের পাত্র। 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—বাজারের দোকানদারের মতন এমনধারা ব্যবহার কেন তাঁর হবে ?—এমনি সব বলছিলেন, কেমন ?

হাস্যমুখে শঙ্কর তাকিয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে গেছে প্রণব। বলে, কথা সব শুনেছেন তবে ?

আগেও তো ঘটেছে, নতুন করে কেন শুনতে হবে ? এ সমস্ত বাঁধা গৎ। শিল্পী আমি, সন্দেহ কি। কিন্তু সে আমার রসিক দর্শকদের কাছে। তাদের কখনো ফাঁকি দিই নে, ভাল মতো জানেন তাঁরা। থিয়েটারওয়ালাদের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক—ওঁরা টাকা দেবেন, আমি কাজ দেব। পুরোপুরি ব্যবসার ব্যাপার। তার মধ্যে খামোকা শিল্পের নাম ঢোকানো কেন ? কথার ধোঁকাবাজিতে আমি ভুলিনে, রজত দা গলে যেতেন।

প্রণব বলল, কর্তামশায়ের মনে খুব লেগেছে। ঐ ক'টা টাকা মেরে আমি কি পালিয়ে যেতাম ? দশের মাঝে উনি আমায় এমনি করে অপদস্থ করলেন।

খুব রেগে আছেন আমার উপর ?

প্রণব বলে, হাবুল-দা তা অবশ্য বলল না। রেগেছেন নতুনবাবু—রাগে গর গর করছেন।

হাসতে হাসতে শঙ্কর বলেন, রাগের চোটে ভাত চাট্টি বেশি করে আজ খাবে। আর কি করতে পারে ?

প্রণব বলে, জানেন না কাকাবাবু, পরের নাটক থেকে নতুনবাবুই আসল মনিব।

শঙ্কর ঘাড় নাড়লেন : কিছু না, কিছু না—আসল মনিব হলেন সামনের দিকে অডিটোরিয়াম জুড়ে যাঁরা সব থাকেন। যদ্দিন ওঁরা খুশি থাকবেন, কেউ কিছু করতে পারবে না। আজ তো শুধু কথা-কথান্তর—যদি বাপান্ত করি জুতোপেটা করি, অন্তরালে গালিগালাজ করবে—দরকারে দড়াম করে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে।

হেনকালে দরজা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দিলেন—আরে, তারামণি এসে গেলেন। মণিসুন্দরের আমলের সেই তারামণি, প্রবাদের রমণী। শঙ্কর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, উঠে পড়ো প্রণব, চেয়ার নিয়ে গিয়ে জুত করে বসিয়ে দাওগে।

সেই তারামণি—যাঁকে নিয়ে কতরকম গল্প লোকের মুখে মুখে। বুড়ো-খুনখুনে। গায়ের রঙটা ধবধবে সাদা এখনো—কিন্তু হলে কি হবে, চামড়া সর্বত্র কোঁচকানো। বিধাতাপুরুষ একদিন অনেক খাটনি খেটে পরম সুষমায় মুখখানি গড়েছিলেন—শেষটা কি কারণে বুঝি ক্ষেপে গিয়ে নিজের অনুপম সৃষ্টির চিহ্নটুকুও রাখতে নারাজ : এদিক ওদিক থেকে ঢেরা কেটে তার উপরে খিচিমিচি করে দিয়েছেন। মুখাকৃতি নিয়ে এখন রয়েছে বলিরেখায় ঢাকা বীভৎস এক বস্তু।

যে চেয়ারটায় প্রণব বসেছিল, কাঁধে তুলে নিয়ে সেটা উইংসের গা ঘেঁষে রাখল। তারামণি বসবেন। প্রম্পটার বাণীকণ্ঠ বেজার : নাও, ঘট-স্থাপনা হল। নড়তে চড়তে ঘা খেতে হয়—কানে শোনেন না, চোখেও ঝাপসা দেখেন, নিত্যি নিত্যি কেন যে ঝঞ্ঝাট করতে আসা!

গজর-গজর করছে—কিন্তু শঙ্কর ঘোষালের ব্যবস্থা, কর্তামশায়ের সমর্থন—জোরে বলবার জো নেই।

বসে পড়বার আগে তারামণি রীতকর্মগুলো সেরে আসছেন :

ঠাকুর-প্রণাম—রামকৃষ্ণদেবের ছবির পদতলে মাথা ঠেকানো। গিরীশ ঘোষ-অর্ধেন্দু মুস্তফি-শিশির ভাদুড়ির পাশাপাশি তিন ছবি—তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম। মেয়েদের-সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—সব মেয়েই নয়, অনভিজাত গণিকা-পল্লী থেকে যেগুলো আসে তারাই শুধু—টিবঢাব গড় করছে তারা তারামণিকে। এগিয়ে তারামণি স্টেজের ধারে এসেছেন—পা দেবার আগে নত হয়ে ডানহাতখানা বুলিয়ে মাথায় ঠেকালেন। কত কত শিল্পী-মহাজনের অভিনয়ক্ষেত্র—তাঁদেরই পদরজ নিয়ে নিলেন যেন। বসলেন তারামণি, প্রণব আবার শঙ্করের খোপে চলে গেল।

শঙ্কর বললেন, রাজগঞ্জের বড়কুমার তারামণির নামে একদিন কুমারডিহি মৌজার তিনআনা-চারগণ্ডা দানপত্র করে দিচ্ছিলেন। তারামণির শয্যার দাবি নিয়ে বঙ্গদেশের দুই সুসন্তান—আই-সি-এস'-এ ও রায়বাহাদুরে লড়ালড়ি, আই-সি-এস'কে চাকরি খোয়াতে হল এই বাবদে—সে-ও এক রীতিমত রোমাঞ্চক উপাখ্যান। ঐ পথ ছেড়ে তারপর তারামণি অভিনয়ে মেতে গেলেন, মানুষ পাগল হয়ে ভিড় করত তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর গান-অ্যাকটিং শোনার জন্য। আজকের তারামণিকে দেখে কে তা বিশ্বাস করবে ?

স্টেজ তারামণির কাছে আজও দেবমন্দির। থিয়েটারের দিন আসতেই হবে এখানে—না এলে প্রাণ আইঢাই করে, সাধ্য কি চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন। হলে ঢুকতে দিত না এই কোলকুঁজো ত্রিভঙ্গ বুড়িমানুষটাকে—বারান্দায় মেঝের উপরেই জাপটে বসতেন তিনি। দারোয়ান সেখানেও এক একদিন তেড়ে এসে পড়ত, এমনি অবস্থায় একদিন শঙ্কর ঘোষালের মুখোমুখি পড়ে গেল : আরে সর্বনাশ, কার উপর লাঠি তুলেছিস—জানিস, কে ইনি ? তোর কর্তামশায়কে জিজ্ঞাসা করে আয়।

ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে একেবারে মঞ্চের উপর উইংসের পাশে জায়গা করে দিলেন।

নিশ্বাস ফেলে শঙ্কর বলেন, আজকে আমি প্রচণ্ড ডাঁট দেখাচ্ছি, কর্তার উপরেও তম্বি করছি, কিন্তু 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। ক্ষণস্থায়ী এসব—'নিশার স্বপন সম'। ক'টা বছর পরে দারোয়ানের লাঠি আমার উপরেও তেড়ে আসবে—'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' সর্বক্ষণ আমার চোখের উপর। খোশামুদি কথা তাই এ-কান দিয়ে শুনি, ও কান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিই। যার যা খুশি বলুক গে, দু-হাতে আখের গুছাই। অডিটোরিয়ামের মহামান্য মনিবরা যেদিন বরখাস্ত করে দেবেন, সেদিন আর একটি তারা-মা কিংবা আর একজন রজতদা না হতে হয়।

নাঃ, হেমন্ত মস্ত লোকই—সন্দেহ মাত্র নেই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে ড্রপ পড়েছে। করিডরে বেরিয়ে ঠোঁটে সিগারেট নিয়েছে সে, দেশলাইয়ের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছে--কোন দিক দিয়ে কে এসে ফস্‌স্ করে কাঠি জ্বেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একজন সামনে এসে দাঁড়াল: পান নিয়ে আসি সার? ভুজঙ্গর পান, বিখ্যাত জিনিস--সেই বালিগঞ্জ-বেহালা থেকেও বড় বড় গাড়ি হাঁকিয়ে ভুজঙ্গর পান খেতে আসে।

তারপর প্রশ্ন: নতুন নাটক তো আপনারই?

হেমন্ত অবাক হবার ভান করে বলল, কই, আমি তো কিছু···কে বলল?

বলতে হবে কেন সার? আপনাকে দেখেই ধরেছি।

হেমন্ত বলে, আমায় চেনেন?

হেঁ-হেঁ, ত্রিভুবনে আপনাকে না চেনে কে? অধীনের নাম সূর্যমণি সোম। এই অঙ্কের গোড়াতেই 'আসুন' 'আসুন' করে নায়ক হিরণ্য চৌধুরিকে ঐ যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম সে আমিই। কেমন লাগল বলুন সার?

কথা তো মোটমাট 'আসুন' আর 'আসুন'—তা নিয়ে কতদূর

আর তারিপ করা যায়। ভাসা-ভাসা ভাবে হেমন্ত ঘাড় নাড়ল : হুঁ, ভালই তো।

সবাই ভাল বলে—তবু পাঠের মধ্যে কথা মোটমাট তিন-চারটে। দুঃখের কথা কি বলব, এতাবৎ তেরোখানা নাটকে কাজ করেছি—কথা সর্বসাকুল্যে তেরো গণ্ডাও হবে কিনা সন্দেহ। নতুনবাবু বলেছেন, তিনি একটা নাটক করবেন, তার নাম-ভূমিকায় থাকব আমি। কবে কি করবেন—এতখানি আমার ঠিক বিশ্বাসে আসে না। আপনার কাছে দরবার, নতুন নাটকে পাঠ যাই হোক, কথা যেন বেশি করে থাকে। মুখে বোবা থেকে শুধু হাত-পা নাড়া আর ভাবের অভিব্যক্তি দেখানো—এতে লোকের নজর কাড়া যায় না।

হেমন্তর একবর্ণও আর কানে ঢুকছে না—সভয়ে দেখছে, এদিক-সেদিক থেকে অনেক ব্যক্তি এই মুখো ধাওয়া করেছে। রণক্ষেত্রে ফৌজের দল রে-রে করে এসে পড়ে, সেই গতিক। নাট্যকার সে-ই, কারো বোধহয় জানতে বাকি নেই—নিঃসন্দেহ তদ্বিরে আসছে। সিগারেটে কয়েকটা মাত্র টান দিয়েছে—ধূমপান মাথায় উঠে গেল। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বক্সের খোপে অন্তর্ধান—বিপদের মুখে দুর্গ-মধ্যে লুকিয়ে আত্মরক্ষার মতো।

বাইরে বেশ একটু ভিড়, হেমন্ত আন্দাজে পাচ্ছে। সূর্যমণি তার মধ্য থেকে সুট করে ঢুকে পড়ল। হাতে পাশপোর্ট রয়েছে, বাংলা-পানের দোনা—উত্তম অজুহাত। পান হাতে দিয়ে সূর্যমণি বলে, অধমের আর্জিটা মনে রাখবেন সার। বীর-করুণ-হাস্য সব রকমের পাঠ চলবে। একটা বিশেষ গুণ, ইচ্ছে মতন চোখে জল বের করতে পারি। এক্ষুনি পরীক্ষা দিতে পারি—সীতে কোথা তুমি প্রিয়তমে, বলতে না বলতেই দর-দর করে অশ্রু বেরুবে। দু-চোখেই।

পরীক্ষা আর ঘটে উঠল না। অমিয়শঙ্করের প্রবেশ। কটমট করে তাকায় সে সূর্যমণির দিকে : এঁর সঙ্গে কি ?

আজ্ঞে না। বাংলা-পান দিতে এসেছিলাম।

ঘুর-ঘুর করছ কেন ?—মুচকে হেসে অমিয় বলল, শিগগিরই আমরা শরৎবাবুর একটা বই নামাব ঠিক করেছি। মহেশ। নাম-ভূমিকা তোমার—তুমিই মহেশ সাজবে।

কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে সূর্যমণি বলে, যে আজ্ঞে—

আমার যে কথা সেই কাজ। তবে আর ছটফট কর কেন ? গরু কেমন হাম্বা হাম্বা করে জান ?

কেন জানব না। পাড়াগাঁ থেকেই এসেছি—

তবে আর কি, খাসা হবে।

সূর্যমণি সরে পড়ল। নতুনবাবুর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল।

অমিয় বলে, আপনার পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়েছি হেমন্তবাবু। হাতের লেখা পড়ে সম্পূর্ণ রস পাওয়া যায় না। আপনি পড়ে যাবেন, আমরা কানে শুনব—আর কোথায় ছাঁটতে হবে কোথায় জুড়তে হবে মনে মনে ছকে যাবো খানিকটা। পরশু সোমবার যদি পড়া হয়—অসুবিধা হবে ?

না, অসুবিধা কিসের।

অমিয় বলল, তড়িঘড়ি কাজ আমার, দেরি করা ধাতে সয় না। নাটকের উপসংহার বেশ ভালো—ভিলেনেরই জয়-জয়কার। বস্তা-পচা চিরকেলে মাল নয়। পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়—আজকের জগতে হরহামেসা যা দেখতে পাই! কিন্তু 'প্রতারক' চলবে না, বদখত নাম বদলাতে হবে। 'ছিঁচকে চোর' বলে থাকে না—প্রতারক কথাটার মধ্যে ঐরকম ছিঁচকে-ছিঁচকে গন্ধ। সূক্ষ্মবিচারে কাজকর্ম অবশ্য প্রতারণাই, কিন্তু গুণীজ্ঞানী অভিজাতদের সম্পর্কে ইতর কথায় মানহানির দায়ে পড়বেন যে। ভেবেচিন্তে ভিন্ন নামকরণ করবেন—কেমন ?

সেটা কিছু কঠিন নয়।—হেমন্ত ঘাড় নাড়ল।

হাস্যমুখে অমিয় শুধায় : থিয়েটার কেমন দেখছেন বলুন। বলে সে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল।

হেমন্ত উচ্ছ্বসিত : প্রেমাঞ্জনের তুলনা নেই সত্যি। রজত দত্তর নাম হয়েছিল, মানে বোঝা যায়। বড় শিল্পী, তার উপর অথর চরিত্রটিকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছেন। প্রেমাঞ্জনের উল্টো —তার অভিনয় লোকে নিয়েছে তারই নিজের ক্ষমতায়, অথরের সাহায্য একেবারে নেই। মেক-আপ থেকে আরম্ভ করে চলন বলন সম্পূর্ণ নিজের। জিনিয়াস—ওর এই জিতু সর্দার দেখেই মালুম হচ্ছে।

অমিয় বলে, আরও কিছু মালুম হবে—'বি' সারির সতেরো নম্বর সিটে তাকিয়ে দেখুন এবার। জয়ন্তী মিত্তিরের বাঁ-দিকের সিট, প্রথম অঙ্কে যা খালি ছিল।

হেমন্ত বলে, এক ভদ্রমহিলা বসেছেন।

আপনার জিনিয়াস ছাত্রের স্ত্রী—রেখা। প্রেমাঞ্জনের নামে দুটো সিটের কমপ্লিমেণ্টারি পাশ। একটা খালি যাচ্ছিল—হকের বউ ছাড়বে কেন, সে এসে এবার চেপে বসল।

হেমন্ত তারিফ করে বলে, বাঃ, দিব্যি রূপবতী তো!

প্রেম করে বিয়ে করেছিল বিস্তর বাধাবিপত্তি কাটিয়ে। তখন তো 'সখি আমায় ধরো ধরো'—অবস্থা। আর আজকে এই। মজাটা দেখুন—পাশাপাশি দুজনে, অথচ কেউ কারো মুখ দেখছে না। রেখা উত্তরে মুখ ফিরিয়ে আছে, জয়ন্তী দক্ষিণে। আপনার কপালে থাকে তো ওখানেই আলাদা এক নাটক জমে যাবে। মুখ ফেরাবে ওরা, চোখাচোখি হবে। রেখা হয়তো থুঃ করবে জয়ন্তীর দিকে—মাথা খারাপ তো। জয়ন্তী পাল্টা মুখ ভ্যাংচাবে। চোখের সামনে দুই লড়নেওয়ালীর লড়াই দেখতে দেখতে স্টেজের উপর প্রেমাঞ্জন পাঠ ভুলে গিয়ে ভ্যাবা-গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়াবে। দেখুন কি ঘটে—

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে অমিয় বলে, কিছু মনে করবেন না—আপনার ছাত্র একটা স্কাউণ্ড্রেল। অমন বউটার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। গল্পটা দেব আপনাকে, নাটক বানাতে হবে। দরকারে তাই দিয়ে ওর পিণ্ডি চটকাব।

উঠে পড়ল সে: যাকগে, যা বলতে এসেছি। যত মক্কেলে ছেঁকে ধরবে আপনাকে- অল্প-সল্প তার নমুনাও পাচ্ছেন। সেইজন্যে ব্যবস্থা করলাম, হাবুল আসবে ভাঙো-ভাঙো সময়ে—থিয়েটারের গাড়িতে আপনাকে গোলদীঘি অবধি নিয়ে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে সোজা একেবারে বাড়ি, থামবেন না কোথাও। নতুন নাটক তাহলে পরশু সোমবার পড়বেন। সকাল ন'টায়, মামার ঘরে দরজা বন্ধ করে। ঐ দিনে, বিশেষ করে ঐ সময়টা, একদম ভিড় থাকে না। রবিবারের দু-দুটো পারফরম্যান্সের পর পড়ে পড়ে সব ঘুমোয়। শুনব আমি আর মামা, অন্য কাউকে এখন শোনানো হবে না।

হেমন্ত বলে, বিনুদাকেও নিয়ে আসব।

ব্যস, আর কেউ না। আর্টিস্টরা পরে শুনবে—কাটছাট করে পাকাপাকি হয়ে যাবার পর। আগে ডাকলে অনাছিষ্টি। এটা বাড়াও, সেটা কমাও, ওটা বদল কর—তারাও ধরাধরি করবে। নিজের কোলে কিসে বেশি ঝোল পড়ে, কে কাকে মেরে বেরুতে পারে, এই চেষ্টা। সেটি হচ্ছে না। যা করবার আমরাই শেষ করে তারপরে ডাকব। একটি কথারও তারপরে রদবদল নয়।

হেসে আবার বলল, একাসনে বসে এবারে ডবল-প্লে দেখতে থাকুন—স্টেজে প্রেমাঞ্জনের প্লে, নিচে ওদের দুজনের। কোনটা কেমন জমে, বলবেন আমায়।

॥ ছয় ॥

হলের 'বি' সারিতে ষোল ও সতেরো নম্বরের নিঃশব্দ প্লে কতদূর কি জমল, হেমন্ত ঠাহর করতে পারেনি। অভিনয়-কালে হলের আলো নেভানো—আধ-অন্ধকারে উপরের বক্স থেকে অত নিচেকার এবম্বিধ সূক্ষ্ম কলা নজরে আসে না। আর এই তৃতীয় অঙ্কে এসে প্রেমাঞ্জনও মিইয়ে গেছে কেমন—অভিনয়ে প্রাণ নেই।

এরই মধ্যে এক দুর্ঘটনা।

সিন বদলের সময় স্টেজও অন্ধকার করে দেয়, নতুন সিন এসে পড়লেই আলো জ্বলে—মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। একবার আলো নিভল তো নিভেই আছে। ভিতরে চাপা গলায় কথাবার্তা, ব্যস্ততা। প্রেক্ষাগৃহ অধীর: হল কি আপনাদের—সিন ঘুরতে কতক্ষণ লাগে? সিটি মারছে। পর্দার বাইরে তখন যুক্তকরে অমিয়শঙ্করের আবির্ভাব, ফ্লাস-আলো তার মুখে পড়ল। বলছে, আমাদের একজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অভিনয়ে বাধা ঘটল বলে মাপ চাইছি। এক্ষুনি আরম্ভ হবে।

অসুস্থ থিয়েটারের কেউ নয়—তারামণি। খুনখুনে বুড়ি, অর্ধেক-মরণ মরেই আছেন। লাঠি ঠুকঠুক করে আসা তবু চাই-ই। উইংসের পাশে শঙ্কর ঘোষালের চেয়ারখানার উপর দুই পা তুলে উবু হয়ে বসবেন, নড়ন-চড়ন নেই, চোখের পলকও পড়ে না বোধহয় —শবদেহের মতো নিশ্চল। শীত নেই বর্ষা নেই—অভিনয়ের একটা রাত কামাই দেওয়া যাবে না। আবার থিয়েটার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, কারও দিকে না তাকিয়ে কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে লাঠি ঠুকঠুক করে ফিরে যান।

আজকেও যথারীতি স্থাণুর মতো ছিলেন—ঢপাস করে আওয়াজ। কি হল—কী পড়ল রে, দেখ। তারামণি কাঠের মেঝেয় পড়েছেন।

চোখ বোজা, সাড়া নেই। প্রম্পটার বাণীকণ্ঠ উঁকি দিয়ে বলে, ব্যস—খতম। বুড়ি বাঁচল, আমরাও বাঁচলাম। কর্তারা এলাকাড়ি দিয়েছেন—এখন ডাক্তার এনে সার্টিফিকেট লেখান, শ্মশানের ব্যবস্থা করুন। আপদবালাই সরিয়ে ফেলে থিয়েটার তো চালিয়ে দিন আগে।

কিছু ভিড় ঐখানটা। শঙ্কর ঘোষাল খোপ থেকে এসেছেন। এমন কি দোতলার অফিসঘর থেকে সত্যসুন্দর পর্যন্ত। মড়া হঠাৎ চোখ পিট-পিট করে তাকায়, চিঁ চিঁ করে কথা বলে ওঠে: আমি মরিনি বাবাসকল। ভিরমি লেগেছিল।

তবে আর কি! হঠ যাও সব—। শঙ্কর ঘোষাল আজ আরম্ভে যেমন বলেছিলেন: পর্দা তোল, যার যেমন কাজ—গিয়ে দাঁড়াও।

নাটকে প্রণবের কাজ যেটুকু ছিল, সারা হয়ে গেছে। উইংসের পাশে একটা ইজিচেয়ার এনে তারামণিকে ধরাধরি করে তার উপর শোয়াল। নিয়ে গেল শঙ্করের খোপে। শঙ্কর দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। থিয়েটারের অনুরাগী এক ডাক্তার কাছাকাছি থাকেন—খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন। দেখে-শুনে বললেন, দুর্বল খুব—দেহে বলশক্তি কিছু নেই। ব্যাধি, মনে হচ্ছে, ঐ দুর্বলতাই। তবে এখনই কোন ভয় নেই। ডাক্তারখানা থেকে কয়েকটা ট্যাবলেট ও এক ডোজ ভাইনাম গ্যালিশিয়া পাঠিয়ে দিলেন: এইগুলো খেয়ে যেমন আছেন তেমনি শুয়ে থাকুন। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম, তার পরে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

শঙ্কর প্রণবকে বলেন, আমায় তো সিনে যেতে হবে। তোমার কাজ হল, এখানে মোতায়েন থাকা—কথাবার্তা গোলমাল কোনকিছু না হয়। ধকল কাটিয়ে উঠলে তারপর বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।

অভিনয় পুরোদমে চলছে। হল ছেড়ে জয়ন্তী বেরিয়ে পড়ল।

দেখে সে প্রেমাঞ্জনের অভিনয়। আপাতত প্রেমাঞ্জন স্টেজে নেই, তাই কোনরকম আর মজা পাচ্ছে না। স্টেজের পিছনে পাইকারি গ্রীনরুমের পাশে শঙ্কর ঘোষালের মতোই পৃথক খোপ প্রেমাঞ্জনের জন্য। দরোয়ান জয়ন্তীকে খুব চেনে, মুখ টিপে হেসে সে পথ ছেড়ে দিল।

হাবুল হাত-মুখ নেড়ে তড়বড় করে কী সব বলছে প্রেমাঞ্জনকে—থিয়েটারি পলিটিক্স, আবার কি! এর কথা ওর কানে টুকটুক করে বলে সেই ব্যক্তিরই একান্ত অনুগত সে, এইরূপ প্রমাণের চেষ্টা। প্রেমাঞ্জন আয়নার সামনে বসে শুনে যাচ্ছ, আর মুখের মেক-আপের একটু-আধটু যা ঝরে গেছে নিঃশব্দে দাগরাজি করছে।

জয়ন্তী ঢুকে পড়ে বিনা ভূমিকায় বলে, একটু কথা আছে অঞ্জনদা।

হাবুল তটস্থ হয়ে উঠে পড়ল। প্রেমাঞ্জন বলে, বাইরে থাকো গে হাবুল। হয়ে গেলেই এসো আবার।

একেবারে কাছে এসে জয়ন্তী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, খুব শিগগির নতুন নাটক রিহার্সালে পড়বে। আপনি আমায় একবর্ণ জানাননি।

কিছু অবাক হয়ে প্রেমাঞ্জন বলে, নিজেই তো জানিনে।

আমি জানি। আর নাট্যকার কে, তা-ও বলতে পারি। সে ভদ্রলোক উপরের বক্সে বসে অভিনয় দেখছেন এখন। পায়ের ধূলো-টুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনি খাতির জমাতে লেগে গেছেন। এত খবর জানি আমি।

প্রেমাঞ্জন রাগ করে বলে, পায়ের ধূলো নিয়েছি—তিনি তো আমার ইস্কুলের মাস্টারমশায়।

বাঃ, খাসা! মাস্টারমশায় যখন নাট্যকার, তাঁর উপরে অনেক আবদার চালানো যাবে—এই পাঠটা বাড়িয়ে দিন, ওটা এইরকম করা যায় কিনা দেখুন। আমার জন্য যদি কিছু করতে হয়—এখনই। নতুন মেয়ের জন্য কাগজে এরা বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। দেখতে চান?

বলার অপেক্ষা না করে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে কাগজের কাটিংস বের করল।

প্রেমাঞ্জন বলে, বক্স-নম্বরে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন মণিমঞ্চের, তোমায় কে বলল ?

যে কাগজে বেরিয়েছে, তাদেরই ভিতরের লোক। খুঁজে বের করতে হয়েছে—। উচ্ছ্বাস ভরে জয়ন্তী বলে, পড়ে দেখুন। ঠিক যেন আমাকেই চাচ্ছে, আমাকে সামনে রেখেই যেন রূপ-বর্ণনা—

কিন্তু গুণ-বর্ণনায় যে গণ্ডগোল করে দিয়েছে। 'অভিনয়ে কিছু অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়'—তার কি জবাব ?

মুখ কালো করে জয়ন্তী বলে, দায়ী তার জন্য আপনিই। অফিস-ক্লাবে পাঠ দিয়ে পাঠ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন আপনি, আমি শুধু মুখস্থ করে মরলাম।

প্রেমাঞ্জন জুড়ে দিল : ঘরোয়া থিয়েটারেও পাঠ দিয়ে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল।

জয়ন্তী সুর নরম করে বলে, মানলাম সুবিধে হচ্ছিল না। আপনি শিখিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু সে হল কবেকার কথা, একেবারে পর-অপর তখন, খাটতে যাবেন কেন আমার জন্যে। এখন নিশ্চয় তা হবে না।

কিঞ্চিৎ খোশামুদি সুর মিশিয়ে বলল, সরোজা ছিল অজ-পাড়াগেঁয়ে আনাড়ি মেয়ে—তাকে নিয়ে তো হৈ হৈ পড়ে গেল। আপনার শিক্ষার গুণে। লোকে বলে গাধা পিটিয়ে আপনি ঘোড়া করতে পারেন।

প্রেমাঞ্জন হেসে বলে, লোকে বাড়িয়ে বলে। সরোজা কোনদিন গাধা ছিল না, জন্মসূত্রেই খোড়া। অমনটি স্টেজে আর দেখলাম না। অদ্বিতীয়া।

জয়ন্তী নাক সিঁটকে বলে, অদ্বিতীয়া বই কি। নাক থ্যাবড়া, ময়লা রং—

রূপের দিক দিয়ে সরোজা তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়। কিন্তু গলায় মধু ঢালত। সিনেমায় চেষ্টা করো জয়ন্তী, রূপের হয়তো কদর পাবে। স্টেজে আমাদের রূপ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আর্টিস্ট আসছে যাচ্ছে, দর্শক বেশ কিছুটা দূর থেকে দেখে—মেক-আপ নিয়ে তাদের চোখ সহজেই ফাঁকি দিই। এমনি যে মেয়েটার দিকে চোখ তাকিয়ে চাওয়া যায় না, রূপের রাণী নূরজাহান সেজে দিব্যি সে প্লে করে যায়—কণ্ঠের খেলা দেখাতে পারলেই হল। কিন্তু সিনেমায় ক্যামেরার চোখ, সে চোখে ধাপ্পা দেওয়া মুশকিল। কণ্ঠের ফাঁকি চলে সেখানে। গান গাইতে গিয়ে যে গাধার আওয়াজ তোলে, অন্যের সুরেলা গান তার গলায় দিব্যি বসিয়ে দেওয়া হয়। আগেও বলেছি জয়ন্তী, আবার বলি—স্টেজে তোমার সুবিধে হবে না। সিনেমায় হলেও হতে পারে, বলো তো চেষ্টা দেখি।

থাক, কিছুই করতে হবে না আপনাকে। যা পারি নিজের ক্ষমতায় করব।

জয়ন্তী ক্ষেপে গেছে একেবারে। বলে, আপনি আর্টিস্ট যত বড়ই হোন, মানুষটা সর্বনেশে। সামান্য মুখের কথাটা বলে দিতেও কৃপণতা, অথচ সোনার সংসার ভেঙে দিয়ে সর্বনাশ করেছেন আপনি।

প্রেমাঞ্জনের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে। সামলে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, সর্বনেশে আমি ঠিকই—কিন্তু ভেবে দেখ জয়ন্তী, তোমার সংসার তুমি নিজে ভেঙেছ, আমি নই। সর্বনাশ যদি করে থাকি সে আমার নিজের।

একটুখানি চুপ থেকে আবার বলে, তোমার পাশাপাশি রেখা এসে বসেছিল। থিয়েটার দেখেনি সে—চোখ সারাক্ষণ জলে ভরা, দেখবে কি করে? যাকগে। চারিদিকে লোক ঘুরছে, এসব কথা না হওয়াই ভাল। তুমি যাও।

দুম দুম করে পা ফেলে জয়ন্তী বেরিয়ে গেল।

তারামণি চাঙ্গা হয়েছেন, টরটর করে কথা বলছেন। উইংসের পাশে তাঁর জায়গাটিতে নিয়ে বসাতে বলছেন। সেটা উচিত হবে না, অন্তত আজকের রাতটা তো নয়ই। তার চেয়ে এবারে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হোক। থিয়েটার ভাঙলে ভিড় হবে, এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া ভাল।

শঙ্কর ঘোষাল বললেন, কর্তামশায়ের গাড়িটা নিয়ে তুমি সঙ্গে থেকে পৌঁছে দিয়ে এসো প্রণব।

গ্রীনরুমের পাশে সত্যসুন্দরের গাড়ি আনল। ইঞ্জিচেয়ার থেকে তারামণি গাড়িতে। পাশে প্রণব—ধরে বসেছে। স্টার্ট দিয়েছে। চন্দ্রিমা—আর এক উদ্বাস্তু মেয়ে, থিয়েটারে নতুন যোগ দিয়েছে—ওদিকে হাত তুলে ছুটল : রোখো, রোখো। সে-ও যাবে। ম্যানেজার হরপদকে বলে এসেছে, ঐরকম মানুষ নিয়ে যাওয়া—একা না বোকা—অন্তত দু-জন থাকা ভাল। হরপদ হেসে সায় দিয়েছে।

গাড়ি চলল—তারামণির এপাশে প্রণব, ওপাশে চন্দ্রিমা। দুজনে ধরে বসেছে।

গলির গলি, তস্য গলি—ঘিঞ্জি বস্তি। বড়রাস্তার এত কাছে বড় বড় অট্টালিকার কানাচে এমন পাড়া বর্তমান আছে, চোখে না দেখলে প্রত্যয়ে আসে না। হঠাৎ তার মধ্যে কোঠাবাড়ি—বহু পুরনো, একতলা, মেরামতের অভাবে খসে গলে পড়ছে। মালিক তারামণি দাসী—নতুন বয়সে কোন এক প্রেমিক নাকি বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের জন্য একখানা ঘর ও ঢাকা-বারান্দা, বাকি দু'খানায় ভাড়াটেরা থাকে। ভাড়া যৎসামান্য, অশন ও বসন তারই মধ্যে চালাতে হয়—নিজের, এবং একটা বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে এসে জুটেছে, রাঁধেবাড়ে দেখাশুনো করে, তারও। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়েছে, ভাড়ার বৃদ্ধি নেই। তারামণির তাই বড় কষ্ট।

আজ রাত্রে সেই বাড়ির দুয়ারে ঝকঝকে মোটরগাড়ি। বস্তির অনেক লোক ভিড় জমিয়েছে। থিয়েটারের দুটি সুবেশ সুন্দর ছেলে ও মেয়ে তারাবুড়ির দুই ডানা ধরে পরম যত্নে নিয়ে ঢুকছে—দেখবার বস্তু বই কি।

স্যাঁতসেতে ঘর, কিন্তু আয়তনে বেশ বড়। তারামণির বসবাস বারান্দায়, ঘর প্রায় বন্ধই থাকে, দৈবে-সৈবে ভাল লোক এলে দরজা খুলে বসানো হয়। জোরালো ইলেকট্রিক আলো—সুইচ টিপতে প্রণব স্তম্ভিত হয়ে যায়। চন্দ্রিমাকে বলে, দেখ দেখ—

এ যে বড় বিস্ময়—ঘর মণিমাণিক্যে সাজানো। মাজাঘষা চারখানা দেয়াল ঝকঝক তকতক করছে। মেঝেও তাই—ধুলো-ময়লার কণিকামাত্র নেই কোনদিকে। ঠিক চোখের সামনে দেয়ালের গায়ে কোন মহীয়সীর বিশাল ছবি। অঙ্গে রূপ ধরে না। পাশের তারামণিকে শুধায়: কে ইনি?

আমি, আমি—আবার কে। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী।

মাজা পড়ে-যাওয়া সত্তর বছুরে বুড়ি মানুষটি আর নেই—হাতের লাঠি ফেলে টনটনে খাড়া হয়েছেন। কোটরগত চোখ দুটো জ্বলছে যেন। ঘরময় ছবি। আঙুল ঘুরিয়ে দেয়ালের গায়ে গায়ে চক্কর দিয়ে ফিরছেন: আমি—আমি—আমি—আমি—আমিই সব।

পাগল হলেন নাকি? কে বলবে, এই খানিক আগে মারা গিয়েছেন বলে সকলে ভেবেছিল, ধরাধরি করে ইজিচেয়ারে তুলতে হয়েছিল। হাত ধরে টেনে, কখনো প্রণবকে কখনো-বা চন্দ্রিমাকে, এক একটা ছবির কাছে নিয়ে পরিচয় দেন: আমি নূরজাহান, আমি রিজিয়া, আমি লক্ষ্মীবাঈ, আয়েসা, ইন্দিরা, মীরাবাঈ, পদ্মিনী, শৈবলিনী—। ইতিহাসের আর উপন্যাসের যত নাম-করা নায়িকা, ভাঙা কোঠার দেয়ালে সবাই আসর জমিয়ে আছেন।

ঘরে কয়েকখানা জলচৌকি। উত্তেজনার শেষে তার একখানায় তারামণি বসে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন। প্রণব ও চন্দ্রিমা ঘুরে ঘুরে

দেখছে—দুজনের মধ্যে ভিট-ভিট করে অন্যের অবোধ্য কথাবার্তা। কিছু ইতস্তত করে প্রণবের প্রশ্ন: পুলিস-সার্জেন্টদের ধাপ্পা দিয়ে স্বদেশি ছেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন—সে তো এই ঘরেই?

আমার সবচেয়ে বড় অভিনয়—কে বলেছিলেন জানো? তখনকার মালিক, এই সত্যবাবুর বাবা মণি-কর্তামশাই। যাঁর নামে থিয়েটার।

পুরানো স্মৃতির ভারে তারামণি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। বলেন, মা-মা করত, আমার পেটের ছেলেরও বেশি হয়েছিল ছেলেটা। তাকেই নাগর বানিয়ে বেশরম নাচ, অসভ্য গান, কত রকম ঢলাঢলি বেলেল্লাপনা—আমি কি কম?

হাসছিলেন ফিক ফিক করে। জিভ কাটলেন তার মধ্যে লজ্জায়। হাসতে হাসতে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন—অক্ষিকোটর জলে ভরতি। বলছেন, এত কষ্টে সরিয়ে দিলাম—নেচে-কুঁদে আমার গায়ের রক্ত জল করে। আমার এসেছিল মরতে—ফাঁসির দড়ি গলায় না দিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না পাজি হতচ্ছাড়া বজ্জাতের ঝাড়—

অনেক রাত্রি। পথে বেরিয়েছে যুবা প্রণব আর যুবতী চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমা বরানগরে থাকে, সেই অবধি যাবে প্রণব—পৌঁছে দিয়ে ফিরবে। নির্জন পথে পায়ের শব্দ বাজছে। সহসা প্রণব কথা বলে ওঠে: মা-কুরু ধনজনযৌবন-গর্বম্—। তারামণির গানে নাচে মানুষ পাগল, তারামণির রূপ দেখতে সারা শহর ভেঙে এসে পড়ত, একলা তারামণিকে ভাঙিয়েই নিউ ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিক লাখ লাখ টাকা করল—থুত্থুড়ে-বুড়ি ওই মানুষটিকে দেখে কে তা বিশ্বাস করবে আজ?

॥ সাত ॥

প্রেমাঞ্জন সম্পর্কে অমিয়শঙ্কর বলল, জিনিয়াস। আবার পরক্ষণেই বলল, স্কাউণ্ড্রেল। তাকে নিয়ে নাটক লিখতে বলে। সিনেমা-থিয়েটারে সে নাটক করে—এদিকে তার নিজের জীবনই এক নাটক। লিখবে হয়তো হেমন্ত কোন একদিন। 'প্রতারক' নাম বললে এখন হয়েছে 'মানুষের কান্না'—আপাতত তারই কাপি বগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা গতি হয়ে গেলে যে হয়। প্রেমাঞ্জন-নাটক পরে ভাবা যাবে।

আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় না—প্রেমাঞ্জন হয়েছে শালগাছ। বাপ ভবসিন্ধু। অবস্থা মাঝামাঝি। গলির মধ্যে ছোট্ট একতলা বাড়ি। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, তিন কাঠা জমির উপর কায়ক্লেশে ভবসিন্ধু চারটে কুঠুরি তুলেছিলেন।

প্রেমাঞ্জন নয় তখন—এককড়ি, নিরলঙ্কার পিতৃদত্ত নাম। ওভারসিজ মার্কেটিং কোম্পানির পাবলিসিটি বিভাগের কেরানি। ভবসিন্ধু অ্যাটর্নি-অফিসে কাজ করেন। থিয়েটারওয়ালাদের অনেকেই সেই অ্যাটর্নির মক্কেল। সেই সুবাদে ভবসিন্ধু ইচ্ছামাত্রেই পাশ পেয়ে যান। মার্কেটিং কোম্পানির বড় অফিসারকে বছর খানেক ধরে দেদার পাশ বিলিয়েছেন তিনি—বাড়ি এসে এসে পাশ দিয়ে যান মিসেসের হাতে। অতএব ছেলের এই চাকরিটুকু না হয়ে যাবে কোথা ?

এককড়ির অভিনয়ে বড় ঝোঁক। টালিগঞ্জের এক শখের যাত্রা-দলে পুরুষের পার্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি, কিন্তু স্ত্রী চরিত্রের জন্য লোক জোটানো দায়। গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজতে কেউ চায় না। এককড়ি রাজি। উপরন্তু চেহারা ভারি চটকদার—রাজকন্যা-রাজপুত্র

যা-ই সাজুক, খাসা মানায়—লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখে। পাঠে কিছু গড়বড় হলেও আমলের মধ্যে আনে না।

এরই মধ্যে এক বিষম কাণ্ড—এককড়ি ও পাশের বাড়ির মেয়ে রেখা দারুন প্রেম জমিয়ে বসেছে। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে রেখা, এককড়িও সুন্দর। কিন্তু জাত আলাদা—এককড়ি কায়েত, রেখা গোয়ালা। রেখার বাপ মধুসূদন ঘোষ ঘি-মাখনের ব্যবসায়ে লাল হয়ে গেছেন। বয়স কম রেখার, লেখাপড়া যৎসামান্য জানে, কিন্তু আহ্লাদে মেয়ে—গোঁ বিষম। বাপ-মা-ভাই কেউ কিছু নয়, এককড়িই সব—সে যা বলবে তাই বেদবাক্য। সকলের মাথা-ভাঙাভাঙিতেও তা থেকে নড়াচড়া নেই। মধুসূদন মেয়ের জন্য ভাল সম্বন্ধ আনলেন—স্বশ্রেণীর মধ্যে যতদূর ভাল হতে হয়। সুশ্রী সুন্দর, এম-এ'তে ফার্স্টক্লাস-ফার্স্ট—কাজকর্মে ঢোকেনি এখনো। মধুসূদন চানও না, তাঁর জামাই পরের গোলামি করবে। বিয়ের পর দিন থেকে নিজের কারবারে নিয়ে নেবেন জামাইকে, কোন ঘরে কোন চেয়ার-টেবিলে বসবে তার ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে আছে।

রেখা এসে খবর দিল: আমার যে বিয়ে এককড়ি-দা। বাবা উঠে-পড়ে লেগেছেন।

মা-দুর্গা বলে ঝুলে পড়্—আবার কি!

বর সেই ননীগোপাল—

ভাল হবে, তোর বাড়ি গিয়ে ক্ষীর-ননী খেয়ে আসব।

রেখা বলে, হবে কেমন করে? বিয়ে তো করব আমি। আমি-যে তোমায় ছাড়া বিয়ে করব না।

এককড়িও তেমনি সুরে বলে, হবে কেমন করে পাগলি? আমি যে করব না।

ইস্, না করে আর পারতে হয় না।

জাত আলাদা যে। আমার সেকেলে বাবা তোকে বউ করে নিতে রাজি হবেন না।

রেখা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বিয়ে করবে তুমি। তুমি রাজি হলেই হয়ে যাবে।

এককড়ি বলে, তোকে বউ করে নিয়ে বাড়ি উঠলে বাবা কেটে দু'খণ্ড করে ফেলবে।

রেখার সাফ জবাব : বাড়িতেই যাব না তাহলে।

খাব কি ? ভালবাসা খেয়ে পেট ভরে না রেখা।

নির্ভীক রেখা বলে, তবে খালি পেটেই থাকা যাবে। না হয় মরব। মরার বেশি তো কিছু নয়।

না, তার বেশি আর কি হবে।

একেবারে জোঁকের মতন লেপটে আছে। মরীয়া হয়ে এককড়ি ভবসিন্ধুকে বলে ফেলবে ঠিক করল। কিন্তু দরকার হল না, মধুসূদন ঘোষই একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। বড়লোক মানুষ উপযাচক হয়ে কি জন্য এসেছেন, ভবসিন্ধু বুঝতে পারেন না। আসুন, আসুন—করে তটস্থ হয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

মধুসূদন বিনা ভূমিকায় বললেন, আমার মেয়ের একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে।

খুব আনন্দের সংবাদ।

কিন্তু বাগড়া দিচ্ছে—না হবার গতিক।

ভবসিন্ধু সবিস্ময়ে বলেন, সে কি কথা! কে এমন শত্রুতা করছে ?

কপালের কথা কি বলি। শত্রু বাইরের নয়, আমার মেয়েটাই!

কী মুশকিল! মা অতি শান্তস্বভাব বলেই তো জানি। এমন কুবুদ্ধি হল কেন ?

কিছু ইতস্তত করে মধুসূদন বলেন, জুড়ি হল এককড়ি বাবাজী —মেয়ে সর্বদা তারই নাম করছে।

ঢোক গিলে মধুসূদন আবার বলেন, সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র—সন্দেহ কি। কিন্তু বিপদ হয়েছে, জাত্যাংশে আলাদা হওয়ায় সমাজে আপত্তি উঠবে।

আপত্তি ভবসিন্ধুরও। তবু অপর পক্ষ কেঁচো হয়ে পদতলে পড়েছে, এ মওকা ছাড়বেন কেন তিনি? বললেন, আমরা কুলীন কায়স্থ, মধ্যাংশ-দ্বিতীয়পো—সামাজিক ভাবনা আমারও যথেষ্ট। তবে কি জানেন—ছেলে-মেয়ে উভয়ে যখন একমত, আমার ছেলেকে পারলেও আপনার মেয়ে সামলানো তো বেশি কঠিন। মা-লক্ষ্মী বড্ড জেদি।

মধুসূদন বললেন, সে আমি বুঝব। ছেলের দিকটা আপনি দেখুন।

ইতস্তত ভাব দেখে খপ করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলেন: ছেলে ঠেকান। আমি চিরকাল কেনা হয়ে থাকব।

মধুসূদনের চোখে জল, মুঠোয় নোট। নোটগুলো ভবসিন্ধুকে দিয়ে হাত মুঠোয় এঁটে দিলেন।

এ তো বড় মজা। ভবসিন্ধুর পাঁচ ছেলে—আঁচ করে রেখেছিলেন, ঐ পাঁচ শুভবিবাহে খরচখরচা বাদে নগদ পাঁচটি হাজার নিট মুনাফা রাখবেন। তাতে চার কুঠুরির দোতলা এবং সিঁড়ির ঘরের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এ দেখি, যেমন ছেলে তেমনি রইল—বিয়ে ভাঙার জন্য ফাঁকতালে টাকা আসছে। মধুসূদন চলে যাবার পর গণে দেখলেন, একশো টাকার নোট পাঁচখানা। অতএব রেখায় ও এককড়িতে অবস্থা সবিশেষ ঘনীভূত, সন্দেহ নাস্তি। চাপ দিলে হেন অবস্থায় একশো টাকার আরও যে খান পাঁচেক বেরিয়ে আসবে না, এমন মনে করার হেতু নেই।

চোখ পাকিয়ে এককড়িকে বললেন, মেয়ের কি মন্বন্তর হয়েছে? কত গণ্ডা বিয়ে করতে চাস বল্। এই মাসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি।

এককড়ি চুপ করে থাকে।

সরকার-বাড়ি পাকা-কথা দিচ্ছি—সে-ও আহা-মরি মেয়ে। মধু ঘোষের মেয়ের সঙ্গে হবে না। রেখাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বাতিল করে দিয়ে আয়।

এককড়ি ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল। এবং পরের দিন বিকালবেলা ফিরে এসে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। পিছনে নেমেছে মাথায় ঘোমটা সিঁথি-ভরা সিঁদুর ও-বাড়ির রেখা। কালীঘাটে মা-কালীকে সাক্ষি রেখে এককড়িই সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। এবং বস্তির একটা ঘরে পুরুত-পরামাণিক ডেকে বিয়ের রীতকর্মও মোটামুটি সেরে নিয়েছে।

ভবসিন্ধু গর্জে উঠলেন : ছেলের জায়গা আছে, বউয়ের এ-বাড়ি জায়গা হবে না।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, জোড়ে আবার উঠে পড়ল।

গলির গলি তস্য গলি, তারই মধ্যে এক কুঠুরি—জেনেবুঝেই আগে থাকতে ভাড়া করে এসেছে। যা কষ্টটা করছে রেখা। বড়লোকের মেয়ে—জুতো খুট-খুট করে বেড়াত, পায়ে ধুলোমাটি লাগে নি এদ্দিন, গায়ে আগুনের আঁচ লাগে নি। সেই রেখার কী খাটনি—কাপড়-কাচা জল-তোলা রাঁধাবাড়া সমস্ত একহাতে। একটা ঠিকে-ঝি আছে—বাসন ক'খানা মেজে ঘর মুছে দিয়ে চলে যায়। তা-ও ক'দিন রাখতে পারবে, কে জানে।

রেখার মা সর্বমঙ্গলা এক একদিন হঠাৎ এসে পড়েন। মায়ের প্রাণ বুঝ মানে না। কেঁদে বলেন, সোনার বর্ণ যে কালি-কালি হয়ে গেল মা। ক'দিন থেকে যা আমাদের কাছে।

রেখা বলে, আমি তো ভাল থাকব ভাল খাব মা, কিন্তু আর একজনকে খুন করলেও তো বড়লোকের বাড়ি যাবে না।

তার খাবার দুইবেলা ঠাকুর পৌঁছে দিয়ে যাবে।

আমি সামনে না থাকলে তার খাওয়া হয় না মা।

সর্বমঙ্গলা রেগে বলেন, তিলে তিলে আত্মহত্যা করবি তুই ?

তিলে তিলে করব-না মা, করি তো একই সঙ্গে একদিন জোড়ে করে ফেলব। হৈ-হৈ পড়ে যাবে—

হি-হি করে হাসছে রেখা। বলে, লিখে যাব, 'আমাদের মৃত্যুর

জন্য কেউ দায়ী নয়' এমনি মামুলি জিনিস নয়—লিখব, 'এই মৃত্যুর জন্য আমাদের উভয়ের মা-বাবারা দায়ী'। পুলিস মহলে ছুটোছুটি —আত্মহত্যা না খুন? কাগজে কাগজে নাম-ধাম আর ছবি—জ্যান্ত থাকতে তো হবে না—মরে যাবার পরে। দু-জনের জোড়া-ছবি।

আজকে কত জায়গায় কত ছবি—জোড়া নয়, শুধু প্রেমাঞ্জনের। রেখা বড় একাকী।

এই অবস্থায় সেই এক-কুঠুরির অন্ধকারে প্রথম-বাচ্চা হয়েছিল। ফুটফুটে ছেলে, লম্বা-চওড়া চেহারা। কোন খেয়ালে না-জানি, নাম দিয়েছিল রণবিজয়। ছ'মাস হতে না হতে চলে গেল—তার মধ্যে ছেলের পায়ে একজোড়া জুতো পর্যন্ত দিতে পারে নি। আজকের পাগল রেখা সেই সব বলে কখনো-সখনো, হাউ হাউ করে কাঁদে।

বিনোদ সমাদ্দারের মাথায় তখন 'উঁকিঝুকি' চেপেছে। থিয়েটার ও স্টুডিও-পাড়ায় ঘোরাঘুরি খুব। সেকালের 'শঙ্খধ্বনি'র কথা অনেকে জানে, সেই বাবদে খাতির-সম্ভ্রম করে। বিশেষত মণিমঞ্চের একমাত্র স্বত্বাধিকারী সত্যসুন্দর চৌধুরি, যেহেতু তাঁর বাপও ঐ পথের পথিক। বিনোদকে এককড়ি গিয়ে ধরল—উঁহু, এককড়ি নয়, প্রেমাঞ্জন এবার থেকে। প্রেমাঞ্জনকে নিয়ে বিনোদ সত্যসুন্দরের কাছে উপস্থিত।

আপাদমস্তক বারম্বার তাকিয়ে দেখে সত্যসুন্দর মন্তব্য ছাড়লেন: আহা রে!

বিনোদ বলে, কেমন দেখছ?

সত্যসুন্দর খিঁচিয়ে ওঠেন: এদ্দিনেও তোমার আক্কেল হল না। লাইনের নয়—একে নিয়ে এলে কেন?

এলেম আছে হে। যাত্রা-পার্টিতে স্বচক্ষে কাজকর্ম দেখে তবে এনেছি। থিয়েটারে আসতে চায়। অধ্যবসায়ও আছে।

সত্যসুন্দর সরাসরি এবার প্রেমাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানে কেন মরতে এসেছ ?

বিনোদ হেসে বলে, তোমরা ফাঁদ পেতে রেখেছ কি মানুষের মরণের জন্য ?

সত্যসুন্দর একই সুরে বলে যাচ্ছেন, এখন এই দেবতার মূর্তি, তাকালে নজর ফেরে না—আর পরিণামে হয়তো সামনে এলে দেখার ভয়ে চোখ বুজতে হবে। লুচ্চো, নেশাখোর, বিতিকিচ্ছিরি চোয়াড়ের চেহারা—

বিনোদ বলে, সবাই কি আর হয়! ভালও তো আছে।

সামান্য। সারা জন্ম এদের নিয়েই তো কাটালাম। ছোকরা-ছুকরি নতুন এলে গোড়ায় আমি এমনি করে বলি। ধর্ম তরাই। মনে-মনে ঠাকুরকে বলে রাখি, সাক্ষি তুমি ঠাকুর, আমি কিন্তু সামাল করেছিলাম।

বিনোদ সহাস্যে বলে, যাকগে, ধর্ম-তরানো তো হয়ে গেল। নামটা লিখে নাও দিকি এইবার।

কর্তার সঙ্গে মোলাকাতের এই গল্প প্রেমাঞ্জন রেখার কাছে করেছিল। রেখা তো হেসেই খুন: তুমি কোন ধাতুতে গড়া, কর্তামশায় জানেন না।

প্রেমাঞ্জন ভয় দেখিয়েছিল: বহু আর্টিস্ট পা পিছলেছে ওখানে। তারা অভিনয় করতে যায় না, ঐসব করতে যায়।

এককথায় উড়িয়ে দিয়ে রেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তোমায় জানি বলেই বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সকলকে বিসর্জন দিয়ে তোমায় নিয়ে ভেসেছি।

রেখা তখন মা হতে যাচ্ছে। একদিন প্রেমাঞ্জন বলল, বিনুদাকে ট্যুইশানির কথা বলেছিলাম। একটার তিনি খোঁজ দিয়েছেন।

রেখা বলে, বাতিল করে দাও। এক্ষুনি।

প্রেমাঞ্জন বলে, সংসার তো বাড়তে যাচ্ছে। চলবে কিসে শুনি ?

বাড়ুক না। তোমার এত ক্ষমতা, এমন করে মানুষ মাতাতে পারো। তুমি যাবে প্রাইভেট পড়াতে—ছিঃ!

রেখা দারুন রাগ করল: সংসার আমার। তার উপরে তুমি কেন টিপ্পনী কাটতে আসবে। খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু অসুবিধা হচ্ছে—কী সেটা, বলে দাও। নিজে আমি বাজারে যাব, ঝিকে দিয়ে হচ্ছে না বুঝলাম।

মণিমঞ্চের অভিনয়ে সর্বপ্রথম সেদিন প্রেমাঞ্জন যাচ্ছে। রেখাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। ট্রামে উঠল প্রেমাঞ্জন—রেখাও।

প্রেমাঞ্জন বলে, তুমি কোথা যাবে? ভিতরে যাওয়া ঠিক হবে না কিন্তু। টিকিট করেও না—থিয়েটার জায়গায় কোন-কিছু গোপন থাকে না। বলবে, দেখ, আদেখ্‌লের মতন ল্যাজ ধরে এসেছে। হতাম বড়দের কেউ, রাস্তা অবধি ছুটে এসে খাতির করে তোমায় নিয়ে বসাত।

রেখা বলে, হবে তুমি তাই—বেশি দেরি হবে না। তোমায় ছাই-চাপা দিয়ে রাখবে কার সাধ্য? দপ করে আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে।

দৃঢ়স্বরে আবার বলে, স্টার আর্টিস্টের বউ আমি—মালিক বাড়ি এসে গলবস্ত্র হয়ে নেমন্তন্ন করবে, তোমাদের থিয়েটারে সেইদিন প্রথম আমি পা ছোঁয়াব।

পাগল আর কাকে বলে! প্রেমাঞ্জন তামাশা করে: আগুনের দপদপানি রিহার্শালেই ওরা মালুম পেয়ে গেছে। গলবস্ত্র হয়ে আজকেই তোমার কাছে গিয়ে পড়ত, কিন্তু বস্তির মধ্যে যে গাড়ি ঢোকে না—কি করবে!

ট্রাম থেকে নেমে পড়ল দু-জনে একসঙ্গে, থিয়েটারের একেবারে সামনে। এতক্ষণ ধরে রেখা সেই আগের ভাবনাতেই বুঝি মশগুল ছিল—প্রেমাঞ্জন স্টার-আর্টিস্ট, প্রেমাঞ্জনের বউ বলে রেখারও খাতির খুব। বলল, তখনও কিন্তু ঐখানে থাকব। চিরকাল না

হোক, ছ-মাস ছ-মাস অন্তত। মস্ত মস্ত গাড়ি রেখে মানুষ হেঁটে তোমার কাছে আসবে। কতবড় তুমি—পাড়ার লোকে কদর বুঝবে সেদিন।

বিপরীত ফুটপাথে উঠে রেখা সড়াক করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এই দিকে ওদের এক আত্মীয় থাকে। বিয়ের পর থেকে যাতায়াত বন্ধ। আনন্দের অতিশয্যে হয়তো-বা সেখানে গিয়ে ডাক করতে বসে গেছে।

ছটো সিনে প্রেমাঞ্জনের কাজ—ডায়ালোগ সর্বসাকুল্যে আট নম্বর। কথা ক'টি কখন বলা হয়ে গেছে—স্টেজের পিছনে কিছু দূরের আধ-অন্ধকারে আছে বসে সে চুপচাপ। বাড়ি গিয়ে কী হবে—তার চেয়ে নাটুকে রসে যতক্ষণ মজে থাকা যায় পর্দার পিছনে এই রহস্যময় জগতে। যারা অভিনয় করছে তারা তো বটেই, যারা অভিনয় করে না—স্টেজ ঘোরায় সিন সাজায় প্রম্প্ট করে কনসার্ট বাজায়, এমন কি যারা চা-পান এনে দেয় নটনটীদের, সকলেই এই রহস্য-জগতের বাসিন্দা। প্রেমাঞ্জন সমস্তটা দিন (এককড়িবাবু তখন) মার্কেটিং কোম্পানির কেরানি। দিনের আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে তার প্রবেশাধিকার—অফিসের চালচলনের সঙ্গে তখন আর তিলার্ধ মিলবে না।

আবিষ্ট হয়ে ছিল সে সারাক্ষণ। সাড়ে-ন'টায় শেষ-ড্রপ পড়ল। দর্শক বেরিয়ে গেল, প্রেক্ষাগৃহ খালি। গ্রীনরুমও ক্রমশ জনহীন হচ্ছে। কথাবার্তা ঘরোয়া এখন—কার ছেলের অসুখ, কার বাড়িতে কবে চোর এসেছিল, ইলিশমাছের এবার আমদানিই নেই মোটে। মাটির জগতে সবাই নেমে এসেছে। প্রেমাঞ্জন বেরিয়ে পড়ল অগত্যা।

হন-হন করে যাচ্ছে। মোড় অবধি এগিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠবে, ছটো পয়সা কম লাগবে। পিছনে হাতের স্পর্শ—ভারি মিষ্টি হাত। তাকিয়ে দেখল—রেখা। অবাক লাগে, ভালও লাগে।

তুমি এখানে—এই রাত্রি অবধি? সেই থেকে রয়েছ—বাড়ি যাও নি?

একলা বাড়ি বসে কি করব? দু-জনের রান্না—সে তো সেরে রেখে এসেছি।

প্রেমাঞ্জন বলে, আমি স্টেজের ভিতর ছিলাম, তুমি কি সারাক্ষণ পথে পথে ঘুরছিলে?

বসবার জায়গা নেই বুঝি আমার?

প্রেমাঞ্জন বলে, তা কেন হবে। সুধা-মাসিমা তো এই দিকেই—

শেষ করতে দিল না রেখা, দপ করে জ্বলে উঠল: তোমায় যে নিন্দেমন্দ করে সে আমার মাসি নয়—কেউ নয়। বসবার পুণ্যস্থান দক্ষিণেশ্বর—ঠাকুর রামকৃষ্ণের জায়গা।

জিজ্ঞাসা করে: থিয়েটারের দেবতা হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ—তাই না?

মাথা নিচু করে প্রেমাঞ্জন সায় দেয়: সব গ্রীনরুমে পরমহংসদেবের ছবি—নিত্যি সেখানে ধূপধুনো দেয়। ঠাকুরকে প্রণাম করে তবে আর্টিস্ট স্টেজে যাবে। রীতকর্ম এই সব। প্রোগ্রামেও দেখ—শুরুতে শ্রীদুর্গা সহায় নয়, শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা।

রেখা হাসছে। হাসতে হাসতে বলে, স্টেজে তুমি অভিনয় করছিলে, আর সারাক্ষণ আমি মন্দিরের চাতালে বসে কাকুতি-মিনতি করছিলাম: তোমার যেন জয়-জয়কার পড়ে যায়।

প্রেমাঞ্জন বলল, কথা মোটমাট পাঁচটা কি সাতটা—লোকের কানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সিন পালটে যায়। জয়-জয়কার পড়বার একটু সময় তো চাই।

কিন্তু হল তাই। অঘটন ঘটল। আনকোরা-নতুন আর্টিস্টের মুখের সামান্য কয়েকটা কথা—দু-চার রাত্রের মধ্যেই তাই নিয়ে সাংঘাতিক রকম নাম বেরিয়ে গেল। হল-ভরা দর্শক তাকিয়ে থাকে কতক্ষণে প্রেমাঞ্জনের সিনটুকু আসবে। ধনী বাপের কনিষ্ঠ ছেলে হয়েছে সে—উচ্ছৃঙ্খল, অপদার্থ। এমনিতেই সুরূপ, তার উপর মেক-আপ নিয়ে অপার্থিব চেহারা খুলেছে। বাপের এক নৃশংসতার

প্রতিবাদে কড়া কড়া কথা বলে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নাটক থেকেও ঐ একেবারে বেরোনো—পরবর্তী দুই অঙ্কের মধ্যে কোনখানে আর প্রবেশ নেই। হুল ঐ সময়টা ফেটে পড়ে। রজত দত্ত শঙ্কর ঘোষাল ইত্যাদি পয়লানম্বুরি আর্টিস্টরা তলিয়ে গেলেন—লোকে ঘরে ফিরছে, সবগুলো মুখে প্রেমাঞ্জনের কথা।

খোশামুদি করে হাতে পায়ে ধরে সেদিন মাত্র থিয়েটারে ঢুকল —দেখতে দেখতে কত খাতির তার! ম্যানেজার হরপদ খোঁজ করে স্টেজের পিছনের সেই আধ-অন্ধকার জায়গায় গিয়ে ধরল: কর্তার সঙ্গে কেবল তো মুখের কথা—এইবারে একটা এগ্রিমেণ্ট হওয়া উচিত প্রেমাঞ্জনবাবু, সব আর্টিস্টের সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে। আসুন।

অফিসে নিয়ে চলেছে, আর সমানে জ্ঞানদান করছে: হাততালি শুনে অমনি 'আমি কী হনু রে—' ভাববেন না। মনে দেমাক হলেই বুঝবেন আর্টিস্টের বারোটা বেজে গেল। হাততালির মধ্যে আপনার কতখানি পাওয়া আর নাট্যকারের কি পরিমাণ, তা-ও বিচার করে দেখবেন। যে সিচুয়েশনখানা দেওয়া হয়েছে, ওখানে আপনি না হয়ে আমাদের সূর্যমণি যদি কথা ক'টা বলে ছুটে বেরুত, তার পিছনেও হাততালি পড়ে যেত।

বাইরেরও নজর টেনেছে। বাণী থিয়েটারের লোক ঠিকানা নিয়ে একদিন ওদের বস্তিপাড়ায় গিয়ে পড়ল: আমাদের পরের নাটক নকুল ভদ্র লিখছেন। ভদ্রমশায়কে জানেন তো—বাঁ-হাতে লিখে দিলেও ফেলে-ছড়িয়ে দুশো নাইট। আপনার কাজ দেখেছেন তিনি—আপনাকে ধরেই নাটকটা বানাতে চান। নায়ক হবেন আপনি—মাইনে ডবল। বুঝুন।

ঝামেলা এড়ানোর জন্য প্রেমাঞ্জন মুখ শুকনো করে রীতিমত একখানা অভিনয় করে দিল: ভালই তো হত। কিন্তু কণ্ট্রাক্টে সই মেরে বসে আছি যে! তিনটি বছরের আগে নড়াচড়ার উপায় নেই।

আবার জুবিলি থিয়েটারের এক খবর। উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে

সরোজিনী নামে (থিয়েটারি নাম—সরোজা) একটি মেয়ে পাওয়া গেছে—পাবলিক-থিয়েটারে এই প্রথম নামছে। মেয়ের মতন মেয়ে—সেকালের তারাসুন্দরী নরীসুন্দরীরা যা ছিলেন। সেই মেয়ে নাকি বলেছে, ফাঁকা মাঠে একলা ঢোলের বাদ্যি বাজিয়ে করব কি ? পেতাম প্রেমাঞ্জনবাবুকে, নব পর্যায়ে 'কুসুম ও কাঁটা' করে দেখিয়ে দিতাম অভিনয় কারে কয়।

প্রেমাঞ্জন শুনল। শুনে মুখ বিষণ্ণ করে বলল, লোভ তো হচ্ছে খুব। কিন্তু কি করব, কণ্ট্রাক্টে হাত-পা বাঁধা যে আমার।

তাজ্জব ঘটল কিছু দিনের মধ্যে। প্রেমাঞ্জন জুবিলিতে গেল না তো সরোজাই এসে পড়ল মণিমঞ্চে। এলো উপযাচক হয়ে কম মাইনে স্বীকার করে, প্রেমাঞ্জনের জুড়ি হয়ে নামবে সেই লোভে। মণি-কাঞ্চন যোগাযোগ যাকে বলে। খুব অল্প দিন নেমেও সরোজা রীতিমত নাম করে ফেলেছে।

গেঁয়ো নাম সরোজিনী ছেঁটে কেটে সরোজা বানিয়ে নিয়েছে সে। ফরিদপুরে বাড়ি ছিল। চার ভাইয়ের পরের বোন, আহ্লাদি মেয়ে। উদ্বাস্তু দলের সঙ্গে এসে এক জবরদখল কলোনিতে উঠেছিল। ইস্কুলে পড়ত, পড়াশুনোয় ভাল। কলকাতায় এসে পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরোজিনী কেঁদে বাঁচে না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করল শেষটা। বড় ভাই তখন ইস্কুলে নিয়ে গেল ভরতির জন্য—পেটে না খেয়েও তার মাইনেপত্তর জোগাবে। কিন্তু ইস্কুলে ঢোকানো চাট্টিখানি কথা নয়, বেকারের চাকরি জোটানোর মতোই। বিশেষত উদ্বাস্তুর যখন ধরাচারা নেই—কোন মিনিস্টারের চাপড়াসিটাও সরোজিনীর হয়ে সুপারিশ করতে যাবে না।

হেডমিস্ট্রেস ঘাড় নেড়ে বলে দিলেন, উপায় নেই, ক্লাস সেভেনে সব সিট ভরতি।

চার ভাইয়ের বোন সরোজিনীর চোখ দুটো বড়ো বড়ো—

সামান্যে চোখ ভরে জল এসে যায়, অঝোর ধারায় গাল বেয়ে গড়ায়। বাড়ির লোকে বলত, লেবুর পানি—সাবেক কর্তারা কাগজি-পাতি-কলমভাগ লেবু দেদার আর্জে গেছেন। কথা পড়তে পায় না—সেইসব লেবুর রস জল হয়ে চোখে এসে পড়ে। ইচ্ছে মতন কেঁদে ফেলা—এই জিনিসটা কিন্তু সিনেমা-থিয়েটার জীবনে সরোজার খুব কাজে এসেছে। গ্লিসারিন লাগে না এই আর্টিস্টের—কান্নাটা তাই অতি-স্বাভাবিক হয়ে লোক কাঁদাতে পারে।

ইস্কুলের ব্যাপারেও চোখের জল গালে গড়িয়ে এলো। হেডমিস্ট্রেস গলে গেলেন : কেঁদো না তুমি। পরশুদিন এসো—একটা মেয়ের ট্রান্সফার নেবার কথা আছে, দেখব।

ইস্কুলে ঢুকল সরোজিনী। চালাক-চতুর মেয়ে, আন্টিরা খুশি। অন্য মেয়েরা সাজগোজ করে আসে, নিত্যিদিন সাজ বদলায়—আজ যে পোশাক কাল তা নয়। কিন্তু সরোজিনী পাবে কোথায়, একই কাপড় ময়লা না হওয়া অবধি পরে আসতে হয় তাকে। অন্যেরা সরে সরে বসে, কী গন্ধ কী গন্ধ—বলে নাক সিঁটকায়। একদিন কালি ঢেলে কাপড় নষ্ট করে দিল—অসাবধানে যেন পড়ে গেছে পরের দিন অগত্যা কামাই—বিস্তর সাবান ঘষাঘষি করে, খানিকটা কালি তুলে সেই কাপড়েই আবার আসতে হয়। চরম হল কয়েকটা দিন পরে। ইস্কুল থেকে সরোজিনী বাড়ি ফিরছে—সহপাঠিনী এক মেয়ে কাগজে মুড়ে পুরানো শাড়ি একখানা হাতে গুঁজে দিল। বলে, দু-খানা তো হল—বদলে বদলে পরে এসো ভাই। আর, সেই পথের উপরেই গরিব মেয়ের হাপুসনয়নে কান্না।

কান্না একেবারে পোষাপাখি,—ইচ্ছা মাত্রেই বেরিয়ে আসে। পরিণামে তাই সরোজিনীর সকলের বড় সম্পদ হয়ে উঠল। কলোনিতে বাস—নানান জেলার নানা ধরনের মানুষের পাশাপাশি ঘর। পুজোর সময় সর্বজনীন দুর্গাপুজো হবে, এবং সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী থিয়েটার। সে থিয়েটার নিজেরাই যা পারে করবে। এমন কি

স্ত্রী-চরিত্রের জন্যে বাইরে যাবে না—ক'টি ছোঁড়া গোঁফ কামিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি। কিন্তু মেয়ে-তরফের আপত্তি : তা কেন, আমরা কি সব বোবা? অর্থাৎ শহরের প্রগতি ঐ উদ্বাস্তু কলোনিতেও সেঁধিয়েছে। বেশ ভাল—পুরুষ-ভূমিকায় বেটাছেলে, স্ত্রী-ভূমিকায় মেয়েলোক। সরোজিনীও নামল—বেছে বেছে তার জন্য একখানি পাঠ, যাতে উঠতে বসতে কান্না। কেঁদেই সে মাতিয়ে দিল। লোকের মুখে মুখে জয়-জয়কার। এমেচার থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্রের জন্য প্লেয়ার ভাড়া করে প্রায়ই। সরোজিনীর ডাক আসতে লাগল। রোজগার মন্দ নয়। খবর ক্রমশ পাবলিক থিয়েটার অবধি পেঁীছে গেল। তাদের লোক আসছে। জুবিলি থিয়েটার এসে গেছে, বাণী থিয়েটার বেশ একটা পছন্দসই দর হাঁকল। সরোজিনীর মন ওঠে না। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার—সে মণিমঞ্চের দিকে তাক করে আছে। মণিমঞ্চে প্রেমাঞ্জন—'নাট্যাকাশে নব সূর্যোদয়' বলে যার নামে ঢাক পেটাচ্ছে। প্রেমাঞ্জনের সঙ্গে এক মঞ্চে অভিনয় করতে চায় সে। অবশেষে হাবুল দেখা দিল একদিন কর্তামশায় সভ্যসুন্দরের তরফ থেকে। মাইনে বড্ড কম, বাণীর প্রায় আধাআধি। তবু সরোজিনী হাতে-স্বর্গ পেয়ে গেল।

গোড়ার একখানা দু-খানা নাটকে যেমন-তেমন। নাট্যকার নকুল ভদ্র মশায় অডিটোরিয়ামে বসে নতুন মেয়েটার উপর সুতীক্ষ্ণ নজর রেখে যাচ্ছেন। তারপর তিনি নিজে একখানা ছাড়লেন। ঘোরতর বিয়োগান্ত নাটক। সরোজিনী নয় আর এখন, সরোজা হয়েছে। তারই কান্নার ছবিটা মনের সামনে রেখে ভদ্রমশায় নায়িকা চরিত্র গড়েছেন। নায়িকা সরোজা, এবং নায়ক অবশ্যই প্রেমাঞ্জন। কেঁদেই মাতিয়ে দিল সরোজা, প্রেমাঞ্জনের বিপরীতে সমান দাপটে পাঠ করে গেল। পালা সুপার-হিট—শহরময় এখন আর একলা প্রেমাঞ্জন নয়, দুই নাম সরোজা-প্রেমাঞ্জন। দুই নাম একসঙ্গে জুড়ে সকলের মুখে মুখে চলছে। শুধু যে স্টেজের অভিনয়ের কারণে, তা

নয়। সরোজা-প্রেমাঞ্জন দুজনকে জড়িয়ে বাজারে নানাবিধ রসালো গুজব। সত্যি মিথ্যে খোদায় মালুম—লোকে বলে সুখ পায়। সরোজার চেহারা আহা-মরি কিছু নয়, কিন্তু প্রাণ-ঢালা তার অভিনয়। তার পাশে প্রেমাঞ্জন মেতে যায় একেবারে। প্রেমাঞ্জন ভাল অভিনয় করে, সকলে জানে। কিন্তু অভিনয় যে কতদূর উঠতে পারে, সেটা বুঝতে পারি নায়িকা হয়ে সরোজা যখন মুখোমুখি দাঁড়ায়। ভুলে যায়, সাজগোজ করে অভিনয়ে নেমেছে তারা—সামনের ছায়ান্ধকারের মধ্যে শত শত নরনারী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে। কে—কে তুমি ?—আবিষ্ট আর্তকণ্ঠ প্রেমাঞ্জনের : রেবা, আমার রেবা, কোন মূর্তিতে এলে তুমি আজ ? সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহ থর থর করে কাঁপছে যেন ভূমিকম্পের মতন। সরোজার দু-চোখে ঢল নেমেছে। দর্শক, থিয়েটারের কর্মী এমন কি নটনটীদের মাঝেও একটি মেয়ে নেই একটি পুরুষ নেই, যার চোখ শুকনো। মায়ের কোলে অবোধ শিশুটির অবধি থমথমে ভাব। সরোজার সম্বিত একেবারে বুঝি লোপ পেয়েছে, সম্মোহিতের ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রেমাঞ্জনের বুকে। আলিঙ্গনে দৃঢ়সম্বন্ধ। রেবা, আমার রেবা—অনতিস্ফুট কণ্ঠে অবিরত প্রেমাঞ্জন বলে যাচ্ছে। সে কথা শোনা যায় না খুব-একটা বাইরে—সকলে তবু উৎকর্ণ! চরম ক্লাইম্যাক্সে পর্দা পড়ল, আলো জ্বলে উঠল। দর্শক উন্মাদ, করতালিতে চতুর্দিক ফাটিয়ে দিচ্ছে। নায়ক-নায়িকার ঘোর কাটেনি, রেবা রেবা রেবা আমার—চলছে এখনো।

হি-হি করে হেসে প্রম্পটার বাণীকণ্ঠ বলে, ছাড়ুন এইবারে প্রেমাঞ্জনবাবু। পরের সিন সাজাতে হবে না ?

রেখার কানে উঠেছে। প্রেমাঞ্জন আর সরোজা বড় বেশি গদগদ—গতিক ভাল না কিন্তু। ও-বাড়ির বউ অমলা এসে বলে, শহরময় টি-টি, তুমিই কেবল জানো না কিছু ? স্টেজের উপরেই

সরোজা সাপের মতো জড়িয়ে ধরে, ছোবল মারে সাপেরই মতন। তাবৎ মানুষ ভেঙে এসে পড়ছে, তুমিই কেবল দেখলে না।

অভিনয়ের মাঝে অনেক স্থলে সরোজা কেঁদে পড়ে—কান্নায় দক্ষ বলে তার নাম। কিন্তু প্রেমাঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে যে কান্না সে কাঁদে, তার বুঝি জাত আলাদা। চোখের অশ্রু নয়, বুকের রক্তই যেন জল হয়ে চোখ দিয়ে বেরোয়। সরোজার কথাগুলো শেষ হয়ে গিয়ে প্রেমাঞ্জন বলছে—কাছের দর্শকেরা তখনও দেখে, সরোজার ঠোঁট নড়ছে। বিড়বিড় করে কত কী যেন বলে যাচ্ছে, তা-ও বোঝা যায়। ফল অতি আশ্চর্য—একবর্ণ না বুঝেও হলের এ-মুড়ো ও-মুড়ো হাততালি।

সরোজা বলছিল—(নাটকে নেই, পাঠের বাইরে সরোজার নিজেরই ছাইভস্ম বানানো কথা এসব)—প্রেমাঞ্জনের বাহুবন্দী হয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠের মতন সে বলছে, জানো, এই জীবনই চেয়েছিলাম আমি। বিয়েও হবো-হবো— আর-একজনে হয়তো এমনি করেই জড়িয়ে থাকত। কে চায় নাম-যশ, কে চায় টাকাকড়ি? একখানা ঘর, সামান্য একটুকু সংসার, ছোট্ট এক খোকা—তাতেই তো বর্তে যেতাম আমি।

বিড়বিড় করছে—বুকের উপরে মুখ, তবু প্রেমাঞ্জন তার একটি বর্ণ বোঝে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমন জোরালো অভিনয় একেবারে মিইয়ে গেল। সিন থেকে বেরুনোর মুখে সরোজার হাত টেনে প্রেমাঞ্জন বলে, পরের সিনে তুমি নেই আমিও নেই। জিরিয়ে নিয়ে আমার ঘরে এসো, কথা আছে—জরুরি কথা।

গিয়েছে তাই। প্রেমাঞ্জন দরজায় একেবারে খিল এঁটে দিল। যুবতী মেয়ে নিয়ে সকলের সামনে—বিশেষত যাবতীয় থিয়েটারি চোখের সামনে খিল আঁটা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রেমাঞ্জন তাই করল—হুঁশজ্ঞান ঠিক লোপ পেয়ে গেছে তার, এত বেপরোয়া সজ্ঞানে হওয়া সম্ভব নয়। হেসে হেসে অভিনয়ের ঢঙেই বলছে, তুমি

যদি রক্ষে করো সরোজিনী—নয়তো নটাধিরাজের নির্ঘাৎ অপমৃত্যু। তোমার প্রেমিক সেজে অভিনয় করি—সেটা আর অভিনয় নেই এখন। শুধুমাত্র মুখস্থ কথা এত বেশি জীবন্ত হয় না। সেকালের গিরিশ ঘোষ একালের ভাতুড়ি মশায়রা হয়তো-বা পারতেন, আমার ক্ষমতার বাইরে। আজকে বড় ধাক্কা খেয়েছি। চরিত্র হয়েছে চুলোর ছাই, পাঠের কথাগুলো দায়সারা ভাবেই কেবল আউড়ে এলাম। তুমি নিশ্চয় তা ঠাহর পেয়েছ, অডিটোরিয়ামের রসিক দু-দশ জনও বুঝেছেন। দর্শক ঠকিয়েছি। এ রকম হতে থাকলে তারা ভিড় করে আসবে না, থুতু দেবে আমার গায়ে।

সরোজা ব্যাকুল হয়ে শুধায়: কি হয়েছে প্রেমাঞ্জন-দা?

প্রেমাঞ্জন হাসিমুখে তেমনি বলছে, আমার বিয়ের সময়কার নাটক থিয়েটারের কে না জানে? বউ কখনো থিয়েটারে পা ঠেকাতে আসে না। কতবার নেমন্তন্ন গিয়েছে, আমি নিজেও বলেছি—ঘাড় নেড়ে দিয়েছে: না—। আমায় জানতে না দিয়ে আজ সে সরাসরি টিকিট করে ঢুকেছে। কোন আড়ষ্ট ভাব নেই—যেন থিয়েটারের পোকা, হরহামেশা এসে থাকে। হলের মধ্যে প্রায় সামনাসামনি—দেখছে না সে, দু-চোখ দিয়ে গিলছে আমাদের। তোমার আমার কাহিনী কতদূর অবধি গড়িয়ে গেছে, বোঝ। এর পরে কি তাগত থাকে তোমায় কাছে টেনে প্রণয়ের ডায়ালোগ বলা?

একটু থেমে থেকে দুম করে বলে বসল, হয় তুমি মণিমঞ্চ ছাড়ো, নয়-তো আমি।

কিছু টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত হল তাই। প্রেমাঞ্জন মণিমঞ্চেই গড়ে উঠেছে—কর্তামশায় প্রাণান্তেও তাকে ছাড়বেন না। গেল সরোজা, জুবিলি লুফে নিল তাকে। সবজান্তারা ঘাড় নেড়ে বলে, হবেই। চাঁদ-সুয্যি এক-আকাশে থাকতে পারে কখনো? সরোজার জায়গায় সিনেমা-তারকা রুপালিকে এনে বিজ্ঞাপন ঝাড়তে লাগল: ছবি দেখেই দর্শক পাগল হতেন, এবারে স্টেজের

উপর রক্তমাংসের চেহারায় চাক্ষুষ দেখুন। সঙ্গে রয়েছেন নটাধিরাজ প্রেমাঞ্জন। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

কিন্তু কিছুতে কিছু নয়, ভাঙা নাটক আর জমানো গেল না। মাসখানেকের মধ্যেই নতুন নাটক রিহার্সালে ফেলতে হল। জুবিলিতে ওদিকে সরোজাও সুবিধা করতে পারছে না। অভিনয়ে সে ধার নেই। ভক্তেরা বলে, একলা একজনে কি করবে? জুড়িদার নইলে হয় না। খোল-বাজনার সঙ্গে কত্তাল লাগে, ঢোলের সঙ্গে কাঁশি। জুবিলির মালিক বক্সঅফিস ঘুরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেন: এত মাইনে কবুল করে এনে এই ফল? রোগা হয়ে যাচ্ছে সরোজা দিনকে-দিন, খিটখিটে মেজাজ, নাড়িতেও নাকি সামান্য জ্বর। চার ভাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোটা ভিজিটের ডাক্তার এনে দেখায়। সাহস দিচ্ছে: ভাবিস নে বোন, চিকিচ্ছের ত্রুটি হবে না, মিনিস্টারকে বলে সরকারি ব্যবস্থায় সারিয়ে তুলব।

সরোজিনী বলে, সারাবি তো নিশ্চয়। নইলে তোদের সংসারের খরচা কে সামলাবে?

নরেশ নামে এক ধনীপুত্র, টুকটুকে রং নাদুসনুদুস চেহারা গলায় সোনার হার, সরোজার উপর বড্ড ঝুঁকেছে। আসা-যাওয়া খুব। সরোজার মা তাকে 'বাবা' ছাড়া ডাকেন না, গলায় মধু ঝরে তখন। সর্বকনিষ্ঠ ভাইটা তো এক একবার 'জামাইবাবু' ডেকেই ফেলে—ভুল করে অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে। সরোজা-নরেশে বিয়ে, রটনা থিয়েটার অবধি চলে গেছে। একটা মেয়ে সে কথা তুলতে গেলে সরোজা তাড়া দিয়ে উঠল: ক্ষেপেছিস? পাকাপাকি কিছু হতে গেলে ঐ ভাইরা-ই দেখিস ভণ্ডুল দেবে তখন। নিজের সংসার হলে ওদের অন্ন জোগাবে কে? নরেশবাবুর নেশা তো কাটল বলে —পরেশ গণেশ আরও কত আসবে। মা 'বাবা' 'বাছা' ডাকবেন, ভাইরা 'জামাইবাবু' 'জামাইবাবু' করবে। থিয়েটারের নামটুকু যেতে যেতে যদ্দিন থাকে, ততদিন।

কণ্ট্রাক্টে হাত-পা বাঁধা—ইত্যাদি বলে প্রেমাঞ্জন সেবারে জুবিলির লোককে ভাগিয়েছিল। আসলে ভাঁওতা। নতুন নাটক খোলার মুখে গোড়ার দিকে দু-একবার কণ্ট্রাক্টের মতো কিছু হয়েছিল বটে —সেই নাটকের চালু অবস্থায় অন্য থিয়েটারে যোগ দেওয়া চলবে না। এখন প্রেমাঞ্জন মণিমঞ্চের একেবারে আপন লোক হয়ে গেছে —লেখাজোখার মধ্যে তাকে যেতে হয় না। তখন জুবিলিতে যায় নি—এতদিন পরে সময় বিশেষে একটু-আধটু ভয় দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই। সত্যসুন্দরের উপর সে কৃতজ্ঞ—তাঁরই দয়ায় পাবলিক-মঞ্চে প্রথম এসে দাঁড়াল, এবং সিনেমা-থিয়েটার রাজ্যে তার 'নটাধিরাজ' নাম। সত্যসুন্দর মানুষটি নাটক বোঝেন না, বুঝতেও চান না। থিয়েটারি ব্যবসা সম্পর্কেও প্রায় তদ্রূপ—চালু জিনিসটা যন্ত্রবৎ চলে আসছে, এই পর্যন্ত। তবে মানুষটি উদার। যার যা উচিত প্রাপ্য —বলতে হয় না, নিজে থেকেই যথাসাধ্য দিয়ে দেন। প্রাতঃস্মরণীয় পিতার কিছু কিছু গুণ তাঁর মধ্যেও বর্তেছে। বলেও থাকেন, ব্যবসা চলছে আমার ক্ষমতায় নয়—পিতার পুণ্যে।

কিন্তু আর বুঝি চলে না। হালফিলের ধরন ধারণ একেবারেই মিলছে না তাঁদের কালের সঙ্গে। মণিমঞ্চ ধারদেনায় ডুবতে বসেছিল। ভাগনে অমিয়শঙ্কর ঝাঁপিয়ে পড়ে দায়দায়িত্ব নিয়েছে, ঘরের টাকা এনে জরুরি দেনা মেটাল। থিয়েটারের ভার তার উপরে দিয়ে সত্যসুন্দর নিজে খানিকটা সরে থাকতে চান। অমিয় বলছেও লম্বা লম্বা, সিনেমা থিয়েটারে প্রতিযোগিতা—বাঁচতে হলে থিয়েটারকে এখন সিনেমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে দিয়ে চলতে হবে। তাই করবে সে। এই এখানেই দেখতে পাবেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস টিকিট কেনার জন্য কালোবাজারি চলছে।

॥ আট ॥

পাণ্ডুলিপি নিয়ে হেমন্ত সোমবার যথাসময়ে মণিমঞ্চে গিয়ে হাজির। একা এসেছে। বিনোদ কী দরকারে আগে-ভাগে বেরিয়েছে—সত্যসুন্দরের বাড়ি হয়ে তাঁদের সঙ্গে আসবে।

জনশূন্য থিয়েটার—নিঃশব্দ। কর্তার কামরার মুখে যথারীতি মথুরা। সসম্ভ্রমে সে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে পাখা চালিয়ে দিয়ে বলল, বসুন সার, চা নিয়ে আসি ?

হেমন্ত ঘাড় নাড়ল : চা খেয়ে এসেছি, একবারের বেশি খাইনে।

তবে শরবৎ ?

কিছুই লাগবে না এখন।—হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কর্তা আসেন নি—খবর-টবর পাঠিয়েছেন কিছু ?

মথুরানাথ বলে, আমাকেই তো পাঠিয়েছেন। এসে যাবেন এক্ষুনি। ড্রাইভার দেরি করে ফেলেছে—ছোটখুকিকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে অমনি আসবেন।

অনুনয় কণ্ঠে বলল, রোদ বেশ চড়ে উঠেছে সার, শরবৎ নিয়ে আসি। এক চুমুক খেলে ঠাণ্ডা হবেন।

মানা শুনবে না। ছুটোছুটি করে শরবৎ আনল। বড়লোকের ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও এমন ভাল এতদূর ভদ্র, হেমন্ত এই প্রথম দেখল।

শরবৎ খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখল। মথুরানাথের খাতিরের অন্ত নেই—খুঁজে-পেতে কোথা থেকে ছবিওয়ালা সিনেমা-পত্রিকা এনে দিল খানকয়েক। বলে, পাতা উল্টাতে লাগুন। এসে যাবেন কর্তামশায়, দেরি হবে না।

তারপর ফিক করে হেসে বলে, আপনি কেন এসেছেন আমি কিন্তু জানি।

সহাস্যে হেমন্ত মুখ তুলে তাকাল। মথুরা একগাল হেসে বলল,

আপনি নাট্যকার। পাণ্ডুলিপি পড়া হবে আজ। বাইরে দাঁড়িয়ে আমিও শুনব।

আবার প্রশ্ন : বলুন তাই কিনা ?

হেমন্ত বলে, তুমি কি করে জানলে মথুরা ? কাউকে তো বলা হয়নি। গোপন ব্যাপার।

মথুরানাথ সগর্বে বলে, হেঁ হেঁ, কর্তামশায়ের বাড়িতে আর থিয়েটারে আমার এই তেইশ বছর হয়ে গেল। চলন দেখেই আমি ভিতরের খবর বলে দিতে পারি।

তেইশ বছর—বল কি হে ? তোমার নিজের বয়স কত মথুরানাথ ?

মথুরা বলে, যেমন দেখছেন, তা নয় সার, মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। সাত বছর বয়সে বাবার সঙ্গে এসে কাজে লেগেছিলাম। এখন তাহলে তিরিশে পৌঁছে গেছি।

তারপর যা বলার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল : আচ্ছা সার, আপনার নাটকে চাকরবাকর আছে নিশ্চয়—

আছে বোধহয়, ঠিক মনে পড়ছে না।

আমি তো রাজা-উজির হতে চাইনে, চাকরবাকর কিছু একটা পেলেই বর্তে যাই। কর্তামশায় বলেন, তুইও স্টেজে নামবি তো বাড়ির ঝাড়পোঁছ থিয়েটারের ছুটোছুটি কে করে ? ঝাড়পোঁছ, বলুন দিকি, চব্বিশ ঘণ্টাই কি লেগে পড়ে করতে হয় ? সন্ধ্যের পর হপ্তায় দুটো-তিনটে দিন না-হয় বন্ধই রইল। কর্তা রাজি নন। তা আপনি বইতে জায়গা রাখুন—ঠিক করেছি, এবারে গিন্নিকে বলব। হয়ে যাবে।

এত খাতিরের কারণ এইবারে বোঝা যাচ্ছে। আর কি, হেমন্ত তো সৃষ্টিকর্তা বিধাতাপুরুষের সমতুল্য। কিন্তু বাবার উপরেও বাবারা সব থাকেন—বড় দুঃখে নাট্যকার হেমন্ত কর ক্রমশ মালুম পেতে লাগল। থাক এখন—সে পরের কথা।

দোরগোড়ায় আর একজন লোক। মথুরা পরিচয় দেয়, ওদেরই চা-শরবতের দোকান, গেলাস নিতে এসেছে। লোকটা বলে, 'জয়-পরাজয়' দেখে গেছেন—আমি ও-বইতে নেমেছি। মুখ দেখে চিনবেন না—বরযাত্রীদের ভিতরে একজন। নতুন নাটকেও আমি থাকব। জনতার সিন হলেই ম্যানেজার ডেকে পাঠান। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের মুখের কাছে চা-শরবৎ এসে পড়ে, এ জিনিসও তাই—ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ম্যানেজারের কাছে হাজির হই। বলছিলাম অথর-মশায়, আমাদের মুখে একখানা-আধখানা কথা দেওয়া যায় না ?

অদূরের বাথরুমে ঝাড়ুদার ফেনাইল ঢালছে, ঝাড়ুদারনি মেঝেয় ঝাঁটপাট দিচ্ছে। হেমন্ত ভাবছে, ওরাও আসবে নাকি এবার ? মিউ মিউ করে বিড়াল এলো একটা। বিড়ালের কথা মানুষে বোঝে না, দরবারটা সেই কারণে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

সর্বরক্ষে, হেনকালে সত্যসুন্দর ও বিনোদের প্রবেশ। সবাই সরে পড়ল, বিড়ালটা অবধি।

হেমন্ত বলল, নতুনবাবু এলেন না ?

জবাব দিলেন সত্যসুন্দর : তাকে লাগবে না। পাণ্ডুলিপি খানিক খানিক পড়েছে, বিনুর কাছে জিনিসটা শুনে নিয়েছে। তার মোটামুটি পছন্দ।

বিনোদ বলে, কানে শুনে তার নাকি মনে ঢোকে না। পাণ্ডুলিপি আলাদা ভাবে আরও একবার দেখে নেবে। এক নাচওয়ালীর খবর পেয়ে সেইখানে সে ছুটল।

হেমন্তর বুকের ভিতর ছাঁৎ করে উঠল : নাচওয়ালী কেন ?

নাটকে লাগাবে, আবার কি !—প্রশ্রয়ের সুরে সত্যসুন্দর বলেন, প্রথম নাটক নামাতে যাচ্ছে। জমানোর কলকৌশল কোনটাই বোধহয় বাকি রাখবে না।

হেমন্তর মুখ শুকায়। কে জানে, এদের খাঁটি মতলবটা কি।

পাকাঘুঁটি কেঁচে যায়, থিয়েটার এমনি জায়গা। আর্টিস্টরা পার্ট মুখস্থ করে ফেলেছে, সিন-আঁকা সারা, একটা-দুটো রিহার্সালও হয়ে গেছে—রাত পোহালে শোনা গেল, নাটক বাতিল। নাকি, কোন জ্যোতিষী মানা করেছেন, অথবা স্বত্বাধিকারীর গিন্নি খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন। এমন নাকি আখচার হয়ে থাকে।

ভয়ে ভয়ে হেমন্ত বলল, আমার নাটকে নাচের তো কোন সিচুয়েশান নেই—

সিচুয়েশান বানাতে কতক্ষণ।—হেসে উঠে সত্যসুন্দর বললেন, কলমের একটি আঁচড়ের ওয়াস্তা।

বিনোদ সায় দিয়ে বলে, ঠিক। এঁরা সব পারেন, করেনও সেইরকম। জুবিলি সেবারে 'চিতা-বহ্নি' নাটক করল—শেষ দৃশ্যে পাশাপাশি তিনটে চিতা। মালিক বললেন, রিলিফ দিন মশায়, নয়তো মানুষ দম ফেটে পটাপট ফ্লোরে পড়বে, আমাদের মামলায় জড়াবে। তাই তো, কী করা যায়? ডিরেক্টর ভেবে-চিন্তে বলল, জবর রকমের নৃত্য লাগিয়ে দেব একখানা, চিতার ধকল কাটিয়ে উঠবে দর্শক। নিশিরাত্রের শ্মশানে ডাকিনী-হাঁকিনীর নৃত্য। একে অন্ধকার, তায় ডাকিনী—বিশেষ-কিছু বাধা রইল না। লোকের হুল্লোড়। বুড়ো-বুড়িরা উঠে চলে গেলেন। দর্শকে চেঁচাচ্ছে: আলোর জোর হচ্ছে না কেন? জোর হতে পারে না—যেহেতু আব্রু মাত্র অন্ধকারটুকুই।

বেশি সময়ক্ষেপ না করে হেমন্ত খাতা খুলল। ঢাউশ খাতা, কুচি কুচি লেখা। বিনোদের দিকে চেয়ে সত্যসুন্দর বিনয় করেন: ভাগনের উপর ছেড়ে দিয়েছি, আমায় আবার কেন? এ যুগে আমরা বাতিল। মনে লাগে, তাই মানতে চাইনে—কিন্তু কথা ষোলআনা খাঁটি। নাটক একের পর এক মার খেয়ে গেল—কই, আগে তো এমন হত না। নতুন অথর এঁরা সব যা লিখছেন, আমি সত্যিই বুঝিনে।

বিনোদ বলে, বোঝ না মানে? ঐ সব বোষ্টম-বুলি আমার কাছে কপচো না। একবার মাত্র কানে শুনে তুমি এখানে সেখানে এমন মোচড় দেওয়াবে, একই গল্প থেকে ঝির ঝির করে নবরস বেরুবে। থিয়েটার-লাইনে এ জিনিস ক'জনে পারে শুনি?

নিরুপায় ভাবে সত্যসুন্দর চেয়ার ছেড়ে সোফায় গেলেন। ছোট্ট তাকিয়াটা কোলের মধ্যে নিয়ে নড়ে চড়ে জুত হয়ে বসলেন তিনি। আরম্ভ সময়ে দু'চোখ মেলা ছিল। শুনতে শুনতে চোখ বুজে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। সর্বদেহে এতটুকু সাড়া নেই—নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখা। নিজের লেখা হেমন্ত পরমানন্দে পড়ছে—পড়েই যাচ্ছে সে। বিনোদ ইশারা করে মাঝে-মধ্যে বাদ দিয়ে বস্তুটা সংক্ষেপ করে নিতে। হেমন্ত প্রাণ ধরে তা পেরে ওঠে না—নিজ হাতে কে সন্তানের অঙ্গচ্ছেদ করে? বারংবার ইঙ্গিত আসছে তো দুটো কি চারটে লাইন বাদ দেয় বড়জোর। বিনোদ তখন হাত বাড়িয়ে খাতার পনেরো-বিশ পাতা একসঙ্গে উল্টে দিল। কয়েক সেকেণ্ড হেমন্ত থতমত খেয়ে থাকে, তারপর সেখান থেকেই আবার পড়ে চলল। শ্রোতার দিক থেকে কিছুমাত্র আপত্তির লক্ষণ নেই—যেমন নিস্পন্দ হয়ে শুনছিলেন, তেমনি শুনে যেতে লাগলেন। সাহস পেয়ে গেছে বিনোদ—আবার এক দফা বেশ কিছু পাতা উল্টে দিল। আবার। আবার। আদ্যন্ত পড়লে ঘণ্টা তিনেকেও হবার কথা নয়, সেখানে পুরো ঘণ্টাও লাগল না। বিনোদ হাঁক পেড়ে উঠল: কেমন শুনলে, বল এবার।

সত্যসুন্দর ধড়মড় করে চোখ মেললেন: খাসা বই, দারুন জমবে। 'মানুষের কান্না'—একেবারে গোটা দুনিয়া ধরে টান দিয়েছেন, আমার-তোমার দুজন পাঁচজনের কোঁতফোঁতানি নয়। চাট্টিখানি কথা!

রসজ্ঞ হিসাবে কিছু আলাদা রকমের মন্তব্য নিশ্চয় প্রয়োজন। সত্যসুন্দর বলেন, এই বই যখন হবে, আমি ভাবছি কি, প্লে ভাঙবার

মুখে ক'জনে আমরা গেটের মুখে দাঁড়াব। যে-লোকের চোখ শুকনো, টিকিটের দাম তাকে ফেরত দিয়ে দেব। মানে, দেখেনি সে-লোক, দেখে থাকলেও তা মঞ্জুর নয়।

পছন্দ হয়েছে তবে ?—বিনোদ শুধায়।

আরে, তোমার পছন্দের বই তুমি সুপারিশ করে পাঠিয়েছ—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, সে জিনিস অপছন্দ করবে। অন্য সব থিয়েটার কানা হয়ে যাবে। শহরের মানুষ ভেঙে এসে পড়বে, থিয়েটার দেখতে দেখতে হাপুস নয়নে কাঁদবে। লোক চলে গেলে তখন ঝাঁটা ধরে হলের অশ্রু সাফ করতে হবে।

ফিরছে হেমন্ত আর বিনোদ। খাতা রেখে এসেছে, অমিয়শঙ্কর নিরিবিলি পড়বে, কাটছাঁট জোড়াতালির যেখানে যতটুকু প্রয়োজন নোট করে রাখবে। হপ্তার মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। পরের সোমবার সন্ধ্যাবেলা স্টেজের উপরে সব সুদ্ধ বসে নাটক-পাঠ। নতুনবাবুর তড়িঘড়ি কাজ। এই রকম সে ব্যবস্থা করেছে, কদ্দর কি হয় দেখা যাক।

হেমন্ত গদগদ। বলে, কর্তামশায় রীতিমত সমঝদার মানুষ। এতখানি কিন্তু ধারণায় ছিল না।

বিনোদের মুখে উল্টো কথা: ঘণ্টা! নিরেট মাথা, মোটা বুদ্ধি। কিচ্ছু বোঝে না—বুঝতেও চায় না। বাপের এমন জমজমাট থিয়েটার ডকে তোলার গতিক করেছে। তবে মানুষটি সৎ। এ লাইনে সেটা গুণ নয়—দোষ। ভাগনেটা ঘোরতর ঘুঘু—অতএব থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে মহাগুণী বলতে হবে।

হেমন্ত মেনে নিতে পারে না, প্রতিবাদের সুরে বলে, আমার নাটক সম্বন্ধে যা-সমস্ত বললেন—নাট্যরসিক বলেই তো মনে হল।

ঘোড়ার ডিম!—কথা পড়তে দেয় না বিনোদ, ভ্রূভঙ্গি করে বলে, একবর্ণ শুনেছে নাকি, চোখ বুজে তো ঘুমুচ্ছিল। নাটকের

নাম বলেছিলে, সেইটেই শুধু মনে ছিল। আমি যা বললাম, তারই উপর কিছু রং ফলিয়ে বিত্তে জাহির করল।

হেমন্ত বলে, এক গল্পে মোচড় দিয়ে নবরস বের করেন—এমনি সব ভাল ভাল জবান তুমিই তো করলে বিনুদা।

করবই তো। থিয়েটার-সিনেমা নিয়ে আমার উঁকিঝুঁকির জীবন। থিয়েটারের মালিক ঐ কর্তামশায়। এতাবৎ একলা ওকে নিয়ে করেছি, এখন থেকে ভাগনে অমিয়শঙ্করকেও এক জোয়ালে জুড়ে আমড়াগাছি করব।

॥ নয় ॥

ক'দিন পরে বিকালবেলা মথুরা হঠাৎ হেমন্তর বাড়ি হাজির। একগাল হেসে বলল, ন'টায় কাল থিয়েটারে নেমন্তন্ন।

কেন বল তো?

ভাল খবর। নাটক পাকাপাকি পছন্দ। কাটকুট ঝাড়পোঁছ এইবারে। নেমন্তন্ন এখন রোজই থাকবে। আমার কথাটা মনে আছে তো সার? দেখবেন।

হেমন্ত বলে, ঠিক তো চিনে এসেছ মথুরানাথ।

চিনে চিনে কত জনা আসবে, দেখতে পাবেন। এ-বাড়ি এখন তো গয়া-কাশী হয়ে উঠল।

ব্যস্ত খুব। থিয়েটারের দিন—সোজা থিয়েটারে যাচ্ছে এখান থেকে।

হেমন্ত যথাসময়ে গিয়ে হাজির। মামা-ভাগনে দুজনেই আছেন। কর্তামশায় আহ্বান করলেন: এসো হে নাট্যকার। এই যাঃ—'তুমি' বলে ফেললাম। বই করতে যাচ্ছি, এখন একেবারে আপন লোক—মুখ দিয়ে 'তুমি' বেরিয়ে গেল।

হেমন্ত পুলকিত কণ্ঠে বলে, আপনার মতো মানুষ 'আপনি' বলতেন, তাতেই তো আমার লজ্জা।

সত্যসুন্দর বলেন, নাটক নিয়ে কিছু বলছি নে, যা-কিছু বলবার নতুন ডিরেক্টর নতুনবাবু বলবে। 'প্রতারক' বদলে নাম দিয়েছ 'মানুষের কান্না'—নামটা নিয়ে সেদিন কত রসালাপ করলাম। তখন তলিয়ে দেখিনি। আগেকার নাম 'প্রতারক' বরঞ্চ পদে ছিল, 'মানুষের কান্না' আমার বাপু মোটেই ভাল লাগছে না।

হেমন্ত মৃদু হেসে বলল, 'ছাগল-ভেড়ার কান্না' বিনুদা বলছিলেন।

কর্তামশায় চমক খেয়ে বলেন, কেন? নাটকে ছাগল-ভেড়া আছে—কই, মনে পড়ছে না তো।

আছে কতকগুলো চরিত্র—ছু-হাত ছু-পা ওয়ালা হলেও আসলে মানুষ নয়, ছাগল-ভেড়ার শামিল তারা। বিমুদা তাই নিয়ে মজা করেন।

সত্যসুন্দর বলেন, আমি বাপু সিরিয়াস। 'মানুষের কান্না'—অমন পাইকারি হারে নাম দিলে বক্তব্যে দানা বাঁধে না, লোকে দিশা করতে পারে না। স্পষ্ট হও—অমুক নামধারী মানুষটার কান্না! নাটকের নায়িকা কে যেন—

হেমন্ত বলে দিল, মেনকা।

মেনকাই কাঁদুক না যত খুশি, কেঁদে আছাড়ি-পিছাড়ি খাক—

উঁহু, উঁহু—। ডিরেক্টর ওদিকে-ঘাড় নাড়ছে: যখন বদলানোই হচ্ছে, 'কান্না' কথাটাই বাদ। ছুঃখধান্দা কান্নাকাটি সংসারে তো আছেই। থিয়েটার-সিনেমায় লোকে যায় ছু-দণ্ড ভুলে থাকার জন্য! সেখানেও যদি কান্না, টিকিট কেটে খরচা করে কি জন্যে লোকে আসবে?

তাহলে 'মেনকার কান্না' নয় বাপু, মেনকার হাসি। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন—দাও লাগিয়ে, ডিরেক্টরের ইচ্ছে যখন।

অসহায় করুণ দৃষ্টিতে হেমন্ত সত্যসুন্দরের পানে তাকাল। বাঁচালে তিনিই হয়তো বাঁচাবেন, এই একটুখানি ভরসা। বলে, নিদারুণ ট্রাজেডি। আপনি হয়তো তেমন মনোযোগে শোনেননি সেদিন—

আজ সত্যসুন্দরের সাফ জবাব: নাঃ, শুনে লাভটা কি? যা সমস্ত লিখেছ, তার এখানটা ছাঁটবে ওখানে জুড়বে। থিয়েটারের দস্তুর এই। সে সমস্ত নতুনবাবুই করবে—আমি মিছে কেন মাথা দিতে যাই।

হেমন্ত বলছে, চরম ক্ষণে নায়িকা মেনকা বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল—সেই অবস্থার মধ্যে কি করে ওকে হাসাই বলুন তো?

আত্মহত্যার জন্যেই বা কে মাথার দিব্যি দিয়েছে শুনি ?

সত্যসুন্দর হা-হা করে হেসে উঠলেন। বলেন, কলম তোমার হাতে—মারতে পারো তুমি, রাখতেও পারো। নায়ক এসে ধরে ফেলুক না মোক্ষম সময়টাতে। তার পরে মিলন, হাসি-তামাশা, জবর ডুয়েটগান—ইচ্ছে করলে সবই হতে পারে।

হঠাৎ সুর পালটে তাড়াতাড়ি বললেন, আমি কিছু জানি নে বাপু। যার কর্ম তাকে সাজে—তোমার ডিরেক্টরই বলে দেবে সব।

অমিয় বলে, মুখে বলবার কিছু নেই। পাণ্ডুলিপিতে সমস্ত নোট করা আছে। হেমন্তবাবু শুধু গুছিয়ে লিখে দেবেন। হাতে কলম চলে না বলেই না একজন করে লেখক লাগে।

পাণ্ডুলিপি হেমন্তর হাতে দিল। গোটা খাতা জুড়ে লাল-পেন্সিলের দাগ, নীল-পেন্সিলের দাগ। কোথায় বাড়বে কোথায় কমবে কোথায় নতুন করে লেখা হবে, তারই সব চিহ্ন। চিহ্নিত জায়গার পাশে সরু পেন্সিলে লেখা বিবিধ নির্দেশ—কি লিখতে হবে, কি কাটতে হবে ইত্যাদি।

এখানে সেখানে হেমন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে। যেন ঘোর অরণ্য, শ্বাপদসঙ্কুল—এর মধ্য থেকে কী করে উত্তীর্ণ হবে ভাবতে গিয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

অমিয় এতক্ষণ বুঝি নামকরণ নিয়েই ভাবছিল। বলে, নাটকের নাম তাহলে—

সত্যসুন্দর বলে দিলেন, মেনকার হাসি।

না—। অমিয়শঙ্কর বলে, মেনকা মোটেই ভাল লাগছে না—মেনিমুখো গোছের শোনাচ্ছে। উর্বশী রম্ভা মেনকা সবাই ওঁরা অপ্সরা—একই জাতের। মেনকা উর্বশী হয়ে যাক না কেন। শুনতে ভাল, জৌলুস বেশি।

সত্যসুন্দর তারিফ করে ওঠেন : 'উর্বশীর হাসি'—তোফা নাম। তোফা, তোফা! নামেই লোক দলে দলে ঢুকবে। হাউস-ফুল।

শুধু বোঝাই নয়, উপচে পড়বে। ভিতরে কি মাল আছে, অত শত দেখতে যাবে না।

হেমন্তর দিকে তাকিয়ে পড়ে সত্যসুন্দরের দৃষ্টি কোমল হল। মোলায়েম সুরে তিনি সান্ত্বনা দিলেন: মুসড়ে গেলে নাকি নাট্যকার? যে বিয়ের যে মন্তোর—বদলাবদলি এখনো কত করতে হবে! তোমার বলে নয়—থিয়েটারওয়ালা আমাদের নিয়মই এই।

অমিয় বলে, এই যে 'জয়-পরাজয়' চলছে, তার বেলাতেই বা কী? ঘাঘি নাট্যকার জগন্ময় দাস লিখে এনে দিলেন। রজত দত্ত রিপুকর্মে বসে ফরমাস ঝাড়তে লাগলেন—কত যে ছাঁটতে হল কত যে জুড়তে হল তার সীমাসংখ্যা নেই। জগন্ময় বললেন, নাটক যে আমারই লেখা, বিশ্বাস হচ্ছে না মশায়। রজত দত্ত খুশি হয়ে রায় দিলেন, তবে এবারে রিহার্সালে ফেলা যেতে পারে। রিহার্সালে পড়েও কি রেহাই আছে? এই শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছে না, বদলে দিন নাট্যকার—

টাইপ-করা কাগজপত্র হাতে অডিটরের লোক দেখা দিল। সত্যসুন্দর ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোমার ঘরে নিয়ে যাও অমিয়। আমরা এদিককার কাজে বসি।

অমিয় বলে, আজকে ঘরে নিয়ে যাবার কিছু নেই। পাণ্ডুলিপি নিয়ে উনি কাজ করুন গে। চার-পাঁচ দিনের বেশি লাগাবেন না হেমন্তবাবু। আমি ব্যস্তবাগীশ মানুষ, তড়িঘড়ি কাজ আমার।

কর্তামশায় বললেন, থিয়েটার-সিনেমায় বই করবে তো লেখার সম্বন্ধে মায়ামমতা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দাও। খোল-নলচে বদল হতে হতে ঘটনার বড় কিছু থাকে না, চরিত্রের নামগুলোই থাকে শুধু। তোমার কপালে তা-ও টিকছে না। পরের নাটক তুমি পেশাদার থিয়েটার নিয়ে লিখো—লেখারই জিনিস।

এখানেই শেষ হল না। রাস্তায় নেমে হেমন্ত ট্রামের অপেক্ষায় আছে, পিছন থেকে কাঁধে হাত। অমিয়শঙ্কর ওদিককার ফুটপাথে

কফিখানায় যাবে—কফি খাবে, আড্ডা দেবে এখন খানিকক্ষণ। দেখা হয়ে গেল তো আরও কিছু উপদেশ ছাড়ে। বলে, যেমন যেমন চাই চুম্বকে লিখে দিয়েছি, যত্ন করে পড়ে নেবেন আগে। কাজ দেখবেন কত সহজ। ডায়ালোগ যত সংক্ষেপে পারেন, একটা কথায় হলে দুটো কথা নয়—প্লেয়াররা পশ্চারে মেরে দেবে। বানিয়ে ছিলেন তো সাংঘাতিক ট্রাজেডি—যেমনধারা ছকে দিয়েছি, কী মধুর কমেডি হয়ে দাঁড়াবে দেখবেন। জয়-জয়কার পড়বে আপনার, থিয়েটার-সিনেমার লোক 'বই দিন' 'বই দিন' করে আপনার দুয়োরে হত্যে দিয়ে পড়বে তারকেশ্বরে যেমন দেয়।

এমন করে আকাশে তুলছে, হেমন্ত তবু চাঙ্গা হয় না—যেমন ছিল, ঝিম হয়ে রয়েছে। খপ করে অমিয় প্রশ্ন করে: প্রেমাঞ্জন কি গিয়েছিলেন আপনার বাড়ি?

হেমন্ত হতভম্ব। বলল, না, কেউ যায় নি। এ কথা কেন বলছেন?

গুরুদর্শনে হঠাৎ যদি উতলা হয়ে থাকেন। নাটকের মন্দার চরিত্রটির উপর নাট্যকারের বড্ড বেশি পক্ষপাত দেখলাম কিনা—সেই জন্যে সন্দেহ হল।

মুখ কালো করে হেমন্ত বলল, পাঠ এখনো বিলি হয় নি। আপনি কোনটা কাকে দেবেন—আমিই জানিনে, প্রেমাঞ্জন জানবে কেমন করে?

আপনি না জানুন, থিয়েটারের ঝানুরা একবার শুনেই ঠিক ঠিক বলে দেবে। ঘষা-মাজা সারা হলে শেষ-পাণ্ডুলিপি আর্টিস্টদের কাছে পড়া হবে—তখন দেখবেন। কার জন্যে কোন পাঠ, কিছুই বলে দিতে হবে না।

হঠাৎ গলা নামিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে অমিয় বলে, নিজের লোক মনে করে গুহ্যকথা বলছি। কাউকে বলবেন না, এমন কি বিনুদাকেও না। দুই নায়ক মন্দার আর অরুণাভ'র মধ্যেকার টাগ-

অফ-ওয়ার—এই জিনিসটাই বিশেষ করে চাচ্ছি আমি, আপনার নাটক এই জন্যেই এত পছন্দ। রজত দত্ত ছিলেন মস্ত গুণী আর্টিস্ট, আমাদের কাজের মধ্যে থেকেই দেহ রাখলেন। তাঁর ছেলে প্রণবকে নিয়ে নিয়েছি, ছেলেটি ভাল—

হেমন্ত সায় দিল: সত্যি সত্যি ভাল। সামান্য আলাপ হল, তাতেই বুঝেছি।

প্রেমাঞ্জনের অসহ্য দেমাক। শাসিয়েছে, না বনলে বাণী থিয়েটারে চলে যাবে। আমি চাচ্ছি প্রেমাঞ্জনকে চেপে প্রণবকে তুলে ধরা। আপনার নাটক খুব যত্ন করে পড়েছি—বিশেষ করে মন্দার আর অরুণাভ চরিত্র দুটো। কপালে থাকলে এক অরুণাভ থেকেই প্রণব বাপকা-বেটা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। মন্দার কমাবেন, অরুণাভ বাড়াবেন—ক্লাইম্যাক্সগুলো অরুণাভর উপরে চাপিয়ে দেবেন। পাণ্ডুলিপিতে যত নোট দিয়েছি, মূল লক্ষ্যটা হল এই।

থিয়েটার থেকে হেমন্ত সোজা উঁকিঝুঁকি-অফিসে—বিনোদের কাছে।

বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বিনু-দা, পাণ্ডুলিপির উপর দাগচোকগুলো দেখ—খানিক-খানিক বুঝবে। 'মানুষের কান্না' হয়ে যাচ্ছে 'উর্বশীর হাসি'। ট্রাজেডি ছিল, আনতে হবে মধুর মিলন। অমুক আর্টিস্টকে মই দিয়ে আকাশে তোলা, তমুককে ল্যাং মেরে পাঁকে ডোবানো—

বিনোদ সহজ ভাবে বলল, কলম নিয়ে বোস। হয়ে যাবে।

হেমন্ত কিছু উত্তেজিত হয়ে বলে, তোমায় দিলে তুমি পারতে বিনু-দা?

কেন পারব না। এই মানুষ আমি শঙ্খধ্বনিতে লিখতাম, এখন আবার উঁকিঝুঁকিতে লিখি। পারছি নে? টাকা আসছে, নাম বেরুচ্ছে—আবার কি!

হাসছিল বিনোদ। হাসি থামিয়ে ভিন্ন এক সুরে বলে, বস্ত্র-হরণের সময় দ্রৌপদী লজ্জাহারী মধুসূদনকে ডেকেছিলেন। তুমিও

মনে মনে লজ্জাহারীকে ডেকে যথা-আজ্ঞা লেগে পড়। জো-সো করে একবার কোটারির মধ্যে ঢুকে যাও, নাট্যকার বলে লোকের মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে যাক—

নাম ছড়াবে না বিমু-দা, বদনাম ছড়াবে। ভিত গড়া হয়েছে ট্রাজেডির, সেই মতো ধাপে ধাপে এগিয়েছি—শেষ মুখে, মাথা নেই মুণ্ড নেই, গায়ের জোরে মিলন ঘটিয়ে দিলেই হয়ে গেল। খুশি হবে না লোকে, নাট্যকারের বাপান্ত করবে।

মাভৈঃ—বলে হাত তুলে থিয়েটারি ভঙ্গিতে বিনোদ অভয় দিল। ন-আটক—কোন-কিছুতে আটক নেই, যা খুশি করা যায় বলেই না নাটক। আমাদের দর্শক-শ্রোতা-পাঠক মশায়দের জানো না, তাই ভয় পাচ্ছ। তাঁরা সর্বংসহা—সামান্যে তুষ্ট, মনের মতো উপসংহারটা পেলেই মজে যান। মাথা-মুণ্ডু নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে গেছ কি মরেছ।

লেখার বাবদে বিনোদ সমাদ্দার হেমন্তর গুরু—ওস্তাদ—আচার্য। ওস্তাদ সবুজ আলো দেখিয়েছে, আবার কি! হেমন্ত মরীয়া হয়ে লেগে গেল। দিন চার-পাঁচ আর দেখা নেই, উঁকিঝুঁকিতেও আসে না। কাটছে, ছাঁটছে, পলস্তারা লাগাচ্ছে। কলম যাদু জানে। ছিল 'প্রতারক', একটি খোঁচায় হয়ে গেল 'মানুষের কান্না'। হুকুম পেয়ে পুনশ্চ এক খোঁচা। কান্না হয়ে গেল হাসি, ধুলোমাটির মানুষ ফুসমন্ত্রে উড়ে গিয়ে হলেন সুরলোকের উর্বশী। আসুক না হুকুম—ঐ 'উর্বশীর হাসি'কে লহমায় নাট্যকার 'হনুমানের লম্ফ' করে দেবে।

কাজ সমাধা করে হেমন্ত বিনোদের কাছে এলো। বলে, কর্তাদের শোনাতে যাচ্ছি।

বিনোদ দাঁড়িয়ে পড়ে: চল, আমিও শুনব। 'প্রতারক' নাটকটা সত্যি সত্যি ভাল ছিল হে। নাক-কান কেটে হাত-পা ভেঙে দিয়ে কোন চিজ বানিয়েছ দেখি।

কর্তামশায়ের কামরায় খিল পড়ল, ছিটকিনি পড়ল। দরজায় পরমবিশ্বাসী মথুরানাথ মোতায়েন। পড়া শেষ হতে ঘণ্টা দুয়েক—তার মধ্যে একবার চা, একবার কফি। মথুরানাথ ঐ দু-বার দরজায় ঘা দেবে, দোর খুলে নিয়ে নেওয়া হবে তখন। এ ছাড়া আর খোলাখুলি নেই—রাজভবন থেকে খুদ লাটসাহেব এসে দাঁড়ালেও না। হেমন্ত পড়ে যাচ্ছে, বিনোদ অমিয় আর কর্তামশায় মনোযোগে শুনছেন।

না, খাসা জমিয়েছে। সমালোচকে হয়তো ভ্রূকুটি করবেন—তাঁরা পয়সা দিয়ে তো টিকিট করেন না, চুলোয় যানগে। এখন যা দাঁড়িয়েছে—প্রেমাঞ্জন ঢুকবে, অ্যাক্টো করবে, বেরুবে—ব্যস, খতম। হাততালি যত কিছু অরুণাভই টানবে—ঠিক যেমন যেমন অমিয়শঙ্কর নোট দিয়েছে। পড়া শেষ হতে হেমন্তর হাত টেনে সে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল: নকুল ভদ্র, জগন্ময় দাস রসাতলে গেল—আগামী দিনের সকলের সেরা নাট্যকার আপনি—দিব্যচক্ষে আমি দেখছি। একটা জিনিসেরই খাঁকতি কেবল হেমন্তবাবু। রিলিফ কই? কিছু রংতামাশা জুড়তে হবে যে ভাই।

হেমন্ত হতভম্ব। ছিল নিদারুণ ট্রাজেডি, সেই নাটক রীতিমত মিষ্টি কমেডিতে দাঁড়িয়েছে। তারও উপরে কী রংতামাশা জুড়বে, সে ভেবে পায় না।

বিনোদ বুঝিয়ে দেয়: রিলিফ অর্থাৎ ভাঁড়ামি—মোটা রসিকতা। ঐ সমস্ত না হলে লোকে নাকি মজা পায় না।

অমিয় জুড়ে দিল: অমন যে শিশির ভাদুড়ী মশায়, তিনিও বাদ দিতে পারেন নি—'সীতা'র মতন নাটকে ভাঁড়-চরিত্র নামিয়ে গলায় মাদুলির বদলে বাবাদুলি ঝুলিয়েছিলেন।

'জয়-পরাজয়' দেখেছ হেমন্ত, তার মধ্যে বুড়ো-বুড়ির কোন্দল মনে পড়ছে?—বলতে বলতে বিনোদ হেসে খুন। বলে, পেয়েছে

তো ছোট্ট আধখানা সিন—তারই মধ্যে কমেডিয়ান সাধন মজুমদার আর বুড়ি শান্তিলতা কী কাণ্ডটা করল। হাসি-হুল্লোড়ে হল ফেটে যাবার গতিক। আমিও বলি হেমন্ত, ঐ দুই আর্টিস্ট যেন বসে না থাকে—নাটকে একটু ঠাঁই দিও।

অমিয় বলে, দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি আর তৃতীয়ের শেষ দিকে দুটো জায়গা চিহ্নিত করে দিয়েছি—হেমন্তবাবুর নজর পড়ে নি বোধহয়। ওদের নিয়ে খাটনি নেই। ডায়ালোগ উপস্থিত মতন নিজেরাই বানিয়ে নেয়, বইয়ের ডায়ালোগ সামান্যই বলে। রোখ চেপে গেল তো মরীয়া হয়ে লেগে যায়, থামাথামি নেই, বাড়িয়েই চলেছে। প্রম্পটারকে দিয়ে তখন হুঁশ করিয়ে দিতে হয়: থামো! অফিসে নিয়ে গিয়ে কড়া ধমক দিতে হয়।

মাঝের বড় চেয়ারখানায় সত্যসুন্দর। গোটা পাণ্ডুলিপি পড়া হয়ে গেল, তারপরেও এত সব কথাবার্তা—বোবা তিনি। বিনোদই শুধায়: কিছু বলছ না যে কর্তামশায়?

সত্যসুন্দর বললেন, বলি। ডিরেক্টর নতুনবাবু রাখতে পারে, না-ও পারে। প্রেমাঞ্জনের খেতাব কি জান? নটাধিরাজ। সরকারি খেতাব নয়, লোকে মুখে মুখে দিয়েছে।

সহাস্যে বিনোদ টিপ্পনী কাটল: আজকের গণতন্ত্রের দিনে রাজা-মহারাজাদের তারি দুর্গতি।

কর্তামশায় বললেন, দেখা যাচ্ছে তাই বটে। প্রেমাঞ্জনকে দিয়ে এই রকম মন্দার করানো শালগ্রাম-শিলায় জিরেমরিচ বাটনার মতো।

বিনোদের কথারই প্রতিধ্বনি করে অমিয়শঙ্কর বলে উঠল, শালগ্রাম বলে আলাদা-কিছু থাকছে না আর মামা। সবই নোড়া। মুড়ি আর মিছরি একদরে বিকোবে।

কর্তা বললেন, সে যখন হবে তখন হবে। মন্দার প্রেমাঞ্জন, আর পাশাপাশি অরুণাভ করবে প্রণব দত্ত—কালকের ছেলে, মুখ টিপলে এখনো মায়ের-দুধ বেরোয়। প্রেমাঞ্জন ভাবতে পারে—

পারে কেন, ভাববেই—ইচ্ছে করে তাকে খাটো করা হয়েছে। আর বাণী থিয়েটার তো মুকিয়েই আছে।

অমিয়শঙ্কর একেবারে গঙ্গাজল : কি করব বলে দাও তবে মামা। পাঠ পালটা-পালটি করব ?

সত্যসুন্দর জোরে জোরে ঘাড় নাড়লেন : মানাবে না। প্রেমাঞ্জন গোঁফ কামিয়ে কচি সাজবে—আর প্রণব কাঁচা-পাকা গোঁফ এঁটে মুরুব্বি হয়ে দেখা দেবে—সে বড় বিশ্রী।

আরো ভেবে বললেন, শেষ ক্লাইম্যাক্সটা অন্তত মন্দার, মানে, প্রেমাঞ্জনের উপর রাখো। অরুণাভ পারবে না, আসর জুড়িয়ে ফেলবে, নাটক মার খেয়ে যেতে পারে। গোড়ায় ছিল—মেনকার শবদেহ জড়িয়ে ধরে মন্দারের হা-হুতাশ, তার উপরে ড্রপ। এবারও প্রায় তেমনি—জ্যান্ত মেনকাকে, উঁহু মেনকা তো উর্বশী হয়ে গেছে, জ্যান্ত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে মন্দারের হাসি-হুল্লোড়, তারই উপর ড্রপ।

অমিয়র কি হয়েছে—মামা যা বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজি। হেমন্তকে বলে, শুনে নিলেন তো ? আগের জিনিস প্রায় রইল—হা-হুতাশের জায়গায় হুল্লোড়।

তখন সত্যসুন্দর আশ্বস্ত হয়ে বলেন, কিছু এলেম তো দেখাতে পারবে—প্রেমাঞ্জন আমায় বড় মান্য করে, এইটুকু দিয়েই ওকে আটকাতে পারব। বুঝে দেখ, রজত দত্ত দেহ রেখেছেন, শঙ্কর ঘোষালকে সরিয়ে দিচ্ছ, তার উপর আবার প্রেমাঞ্জনও যদি না থাকে, তোমার থিয়েটারে লোকে আসবে কিসের টানে ?

আসবে মামা। আমি এক মন্তর জানি—সেই মন্তরে টেনে আনব। লোক ভেঙে এসে পড়বে। প্রেমাঞ্জন যদি না-ও থাকে, তবু আসবে।

হেমন্তর দিকে এক রহস্যময় দৃষ্টি হেনে হাসতে হাসতে অমিয়শঙ্কর সকলের আগে উঠে পড়ল।

॥ দশ ॥

পাণ্ডুলিপি পড়া আজ। নট-নটী একজন কেউ বাদ নেই। অন্য কর্মীরাও উপস্থিত। থিয়েটারের দিন নয়—স্টেজ জুড়ে গালিচার উপর সব বসেছে। পড়ছে হেমন্ত। পড়ার শেষে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ বিলি। ছুটো দিন বাদ দিয়ে রিহার্সাল আরম্ভ। সিনসিনারি আগে থেকেই বানাতে লেগে গেছে। নতুনবাবুর তড়িঘড়ি কাজ। 'জয়-পরাজয়' টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে। যত দিন যাবে, লোকসানের পরিমাণ বাড়বে ততই। 'উর্বশীর হাসি' তিন হপ্তার মধ্যে মুক্তি পাবে—নতুন পরিচালকের সেই ব্যবস্থা।

এরই মধ্যে হেমন্তকে একটু একান্তে পেয়ে প্রেমাঞ্জন ঝট করে তার পদধূলি নিয়ে নিল: আপনার বাড়ি যেতে পারি নি মাস্টারমশায়। সিনেমা আমায় মেশিন করে তুলেছে। সারাটা দিন এ-স্টুডিও থেকে সে-স্টুডিওয় ছুটোছুটি—কোথায় কোন ভূমিকা, সব সময় খেয়াল রাখতে পারিনে, মেকআপ নেবার সময় জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তবু যাওয়া উচিত ছিল, বুঝতে পারছি। মন্দার চরিত্রে বিস্তর সম্ভাবনা ছিল, কাছে থাকলে ধরিয়ে দিতে পারতাম। শেষ মারটা যা ই হোক আমার উপরে রেখেছেন—খেল কিছু দেখানো যাবে মনে হচ্ছে।

অমিয়র নজরে পড়েছে। হেমন্তকে শুধায়: কি বলে প্রেমাঞ্জন?

অখুশি নয়। পাঠ মোটামুটি পছন্দ। শেষ ক্লাইম্যাক্সে বাজিমাত করবে—এই সমস্ত বলল।

ঘোড়ার-ডিম করবে।—খিক-খিক করে হেসে অমিয়শঙ্কর বুড়ো-আঙুল নাচায়। বলে, তোমারে মারিবে যে, গোকুলে রয়েছে সে। নেচে-কুঁদে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে নানান কসরতে প্রেমাঞ্জন যেটুকু যা করবে, সেই জন বেরিয়ে পড়ে লহমার মধ্যে ফুৎকারে সব নেভাবে।

লোকের মুখে মুখে তার পরে আর প্রেমাঞ্জন নয়—আমার সেই আর্টিস্ট।

হেমন্ত বলে, কে তিনি?

সেটি বলব না। তুরুপের তাস, গোপন রেখেছি। সময়ে দেখবেন।—রহস্যময় দৃষ্টি অমিয়র, মুখে মিটিমিটি হাসি।

কোন পাঠ দিয়েছেন তাকে?

তা-ও গোপন।

হেমন্ত বলে, যত বড় আর্টিস্টই হোন, রিহার্সাল তো চাই।

হচ্ছে বইকি। আমি ঘুমিয়ে নেই। এই থিয়েটারেরই পুরানো কায়দা—মামার কাছে শুনবেন। তারামণির স্বদেশি গানে সেকালে জয়-জয়কার পড়ত—সে গানের রেওয়াজ কিন্তু হত অতি গোপনে বস্তিবাড়িতে—আগে কেউ ঘূণাক্ষরে না টের পায়। আমিও তুরুপের তাস বানিয়ে তুলেছি থিয়েটারের ধারে-কাছেও নয়—গোপন জায়গায়, কাকপক্ষীও খবর জানে না। ভুম করে যেদিন সামনে এনে ফেলব, সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, বাজ পড়বে প্রেমাঞ্জনের মাথায়—

মনের সুখে বেশ একচোট হাসল নতুনবাবু। বলে, জেনে রাখুন হেমন্তবাবু, আপনার ছাত্র গোল্লায় গেল এবারে। দেমাক ধুলোয় লুটোবে। একলা প্রেমাঞ্জন কেন, ছোট-বড় সবাই। সবাই এরা প্রতিমার চালচিত্র হয়ে গেল, এদের দেখতে কেউ আসবে না। দেখবে আমার সেই অজানা আর্টিস্টদের।

হেঁয়ালি-ভরা কথাবার্তা। বোঝাচ্ছে অমিয় কৌতূহলী হেমন্তকে: ধৈর্য ধরুন। 'উর্বশীর হাসি' মুক্তি পাবে আসছে মাসের পয়লা বিষ্যুৎবার। তার আগের রবিবার অভিনয় বন্ধ—ফুল-রিহার্সাল আমাদের। সেইদিন দেখতে পাবেন। দেখাব আপনাদের সবাইকে, মতামত নেব—

ফুল-রিহার্সালের সেই রবিবার। সন্ধ্যাবেলা সবাই এসেছে—নতুন আর্টিস্ট কই, কোনদিকে তো দেখা যাচ্ছে না। আরম্ভের ঘণ্টা পড়তেই কোন দিক দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক দিতে দিতে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ। ক্যাবারে-গার্ল—মিস রাকা বর্মণ। থিয়েটার-পাড়ায় নতুন—বার-হোটেলের পাড়ায় নাম আছে। বিশেষ এক ধরনের নৃত্যে ঘোরতর পটীয়সী। ক্যাবারে-রানী—অনুরাগীরা নাম দিয়েছে।

তিন অঙ্কে তিনখানা বিশেষ ধরণের নাচ। নাটকের শুরুতেই অজন্তা নৃত্য—অজন্তা-চিত্রের অনুকরণে। বেশবাস তদনুরূপ। দ্বিতীয় অঙ্কের নাচ হাওয়াইয়ান—হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্রে জাহাজ এসে দাঁড়াত, আর দ্বীপবাসিনীরা তটভূমিতে হুড়-মুড় করে এসে এমনি নাচ নাচত যে নাবিকেরা ঝুপঝাপ ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে মেয়েদের কণ্ঠলগ্ন হত। রাকা বর্মণের নাচখানারও মোটামুটি একই উদ্দেশ্য—বেলেঘাটা-বেহালা-বরানগর-বারাসত এবং আরও দূর-দূরান্তরের বাসিন্দারা গাড়িঘোড়া-জনতার ভিড়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে থিয়েটারে এসে পড়বে। শেষ অঙ্কের সর্বশেষে ব্লু-ডান্স, অনুবাদে দাঁড়াবে নীলনৃত্য—মোক্ষম বস্তু। মন্দার রূপী প্রেমাঙ্কুর নিদারুণ কসরতে অডিটোরিয়াম মাতিয়ে ফেলেছে—সবাই ভাবছে, নাটকে ইতি হল এইবার। কিন্তু ইতির পরেও পুনশ্চ—সে এই সাংঘাতিক নৃত্য। নটাধিরাজ প্রেমাঞ্জন একেবারে ঘায়েল। আগেকার অজন্তা ও হাওয়াইয়ান নিতান্তই গঙ্গোদক ও বিল্বপত্র এই নীলনৃত্যের তুলনায়। একগাদা কাপড়-চোপড় পরে এসে দাঁড়াল রাকা বর্মণ—কর্ণার্জুন নাটকের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সিনে কৃষ্ণভামিনী যেমন আসতেন। মৃদু করুণ বাজনা। নাচছে রাকা। আর বাসাংসি জীর্ণানি বিহায়—শ্রীশ্রীগীতায় আছে না, রাকার অঙ্গবাস মোটেই জীর্ণ নয়—প্রচণ্ড রকমের জিল্লাদার। সেইগুলো দু'হাতে খুলে খুলে ঝলমলে আলোয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে এদিকে-সেদিকে

ছুঁড়ে দিচ্ছে। নিরাবরণ হচ্ছে ক্রমশ, নাচ জোরালো হচ্ছে, এবং বাজনাও। ব্লাউজ খুলে ছুঁড়ে দিল, তারপর বক্ষোবাসটুকুও। নৃত্য উদ্দাম, বাজনা উদ্দাম। পরনের শাড়িটাও একটানে খুলে দলা পাকিয়ে দু-পায়ে চটকায়। আরে আরে, করে কি হারামজাদা বেহায়া মেয়ে, বিকিনি ধরে টানছে—

রাকা বর্মণ ছাড়াও আছে। নাটকের মাঝামাঝি এসে বেশ একখানি চমক—পাগলিনী বেশে জয়ন্তী মিত্তির। কবে তার অমিয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা, কোন কায়দায় অমিয়কে পটিয়েছে, সাতিশয় গোপন। রিহার্সালও গোপনে হয়েছে—গণ্ডা দেড়েক কথার জন্য রিহার্সালের আদৌ যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রেমাঞ্জন সেজেছে মন্দার—ধুরন্ধর কালো-বাজারি। বিপরীতে আছে অমিতাভ-রূপী প্রণব—বেকার যুবক। অথরের দরদ প্রণবের দিকে, যে না সে-ই বলবে। তবু কিন্তু প্রেমাঞ্জন তুলো-ধোনা করল ছেলেমানুষ প্রণবকে। দম্ভ করে বলে, উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা—ধরে নেবার অপেক্ষা। আমি পারি তো তুমি পারবে না কেন? অক্ষম অপদার্থের দল 'আমি গরিব' 'আমি গরিব' বলে নাকি-কান্না কেঁদে বেড়ায়—

বিস্তর ভেবেচিন্তে কায়দা-কসরৎ করে এবং ঈশ্বর-দত্ত অপরূপ বাচন-ভঙ্গিমার গুণে এই জিনিসের উপরেই প্রেমাঞ্জন আপন স্বপক্ষে একখানি ক্লাইম্যাক্স জমিয়ে তুলেছে। অডিটোরিয়াম মুগ্ধ হয়ে শুনছে, কল্পনায় ভেবে নেওয়া যায়। এবং সম্বিৎ পেয়ে পরক্ষণে তুমুল হাততালির উদ্যোগে দু'হাত দু'দিকে তুলেছে, অকস্মাৎ—

উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা—কই! কোথা? বলতে বলতে মাথা-পাগলা উদ্বাস্তু ভিখারিণী মেয়ের প্রবেশ। এক চিলতে ছেঁড়া-কাপড় পরণে। মূল নাটকে নেই—জয়ন্তী মিত্তিরকে নামাবে (এবং প্রেমাঞ্জনের দফারফা করবে!) বলেই ডিরেক্টর অমিয় অ্যাকসনটুকু জুড়ে দিয়েছে। এখন এই—হাউস-ফুল স্টেজের উপর রূপসী যুবতী

ভিখারিণীর মেক-আপে জয়ন্তী মিত্তির আরও বেশি ঝকমক করবে।

উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা—কই গো, কোথায়? বলে গৌরবরণ নিটোল হাত দু'খানা উপর মুখো তুলে পাগলিনী কী যেন মুঠো করে করে ধরে। ধরে, আবার মুঠো খুলে উপুড় করে দেয়: নাঃ, কিচ্ছু না—। হাউ-হাউ করে সে কেঁদে পড়ল। এবং কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান। সাকুল্যে এই মাত্র। বিদ্যুতের চমক দিয়ে অদৃশ্য হল—প্রেমাঞ্জনের মাথায় বাজ হেনে গেল যেন। থ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের ঐ জনহীন প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে ফেটে পড়ছে, কানে যেন শুনতে পায়। এ হাততালি আসলে ছিল প্রেমাঞ্জনের উপরে—তারই কষ্টের উপার্জন লহমায় ছিনিয়ে নিয়ে ছিন্নবাস পাগলিনী ছুটে বেরুল।

বেরিয়ে কারো পানে জয়ন্তী তাকায় না। মুহূর্তমাত্র দেরি নয়—আচ্ছন্নের মতো সোজা চলে গেল প্রেমাঞ্জনের ঘরে। প্রেমাঞ্জন তখনো স্টেজে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সোফায় গড়িয়ে পড়ল। অঙ্ক শেষে প্রেমাঞ্জন আসতেই মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে পড়ল বিজয়িনীর ভঙ্গিতে: মুখের একটা কথা বলে দিতেও আপনি নারাজ। তার জন্যে কিন্তু আটকে থাকল না প্রেমাঞ্জনবাবু।

প্রেমাঞ্জন বলে, দেখছি তো তাই।

জয়ন্তী উচ্ছ্বাস ভরে বলে, ডিরেক্টর নতুন হলে কি হবে—ক্ষমতা ধরেন, গুণের কদর বোঝেন।

প্রেমাঞ্জনের সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী: গুণের নয়, রূপের—

জয়ন্তী ক্ষেপে যায়: ঈর্ষ্যা আপনার। আমার অভিনয়ের সময় আপনি চোখ বুঁজে থাকবেন জানি। কিন্তু অডিটোরিয়াম তা করবে না, চ্যালেঞ্জ করছি।

না, করবে না—। প্রেমাঞ্জনও ঘাড় নেড়ে সজোরে সায় দিল: দু-চোখ দিয়ে তারা গিলতে চাইবে বেআবরু ভিখারিণীকে। সিটি মারবে।

আবার বলে, ক্ষমতা আছে ডিরেক্টরের—তা-ও মানি। নাটকে সিনটা বানিয়েছিল করুণরস-প্রধান, ক্লাইম্যাক্স ছিল অমিতাভর উপর। সেই ক্লাইম্যাক্স কায়দা করে আমি কেড়ে নিচ্ছিলাম। অমিয়শঙ্করের পছন্দ নয়—তোমাকে এনে ঠেকনো দিল, কাপড়-চোপড়ে কৃপণতা করে উল্টেপাল্টে তোমাকে দেখাল। জমিয়ে দিল শৃঙ্গাররস অন্য সমস্ত রস মুছে দিয়ে।

পরের অঙ্কে এক্ষুনি আবার নামতে হবে। মুখের উপর তাড়াতাড়ি কয়েকবার পাফ বুলিয়ে প্রেমাঞ্জন আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

ড্রেস-রিহার্সালের শেষ। শেষের পরেও পুনশ্চ আছে, নতুন ডিরেক্টর অমিয় দর্শকদের নিরামিষ মুখে ফিরতে দেবে না। রাকা বর্মণের সব চেয়ে সরেস নৃত্যখানা—নীলনৃত্য এইবার। দুঃসাহসী বেহায়া মেয়েটা খুলতে খুলতে শেষমেশ বিকিনিটুকু ধরে টানছে—একেবারে দিগম্বরা হয়ে নাচবে আমাদের এত দিনের এই মণিমঞ্চের উপরেই? হলের পিছন দিকটায় অন্ধকারের মধ্যে সত্যসুন্দর। ভাগনে ডিরেক্টর হয়ে প্রথম নাটক নামাচ্ছে—নতুন প্রজন্ম নাকি কথা বলে উঠবে নাটকের ভিতরে, লোভে লোভে তিনি দেখতে এসেছেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে বুড়োমানুষ ফুড়ুত করে পালিয়ে যান। একটি কথা নয় কারো সঙ্গে, মুখও দেখাবেন না কাউকে বুঝি—

অমিয়শঙ্করের দারুন স্ফূর্তি—রণবিজয়ের মনোভাব। বিনোদকে বলে, নাটক লাগবেই—কি বলেন বিনু-দা? হেমন্তর হাত টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল: নাট্যকার নতুন হলে কি হবে, কলমে ধার খুব। প্রথম নাটকেই জয়-জয়কার পড়বে, দিব্যচক্ষে দেখছি। একটু চা-টা খাওয়া যাক, আমার ঘরে চলুন।

যাচ্ছে তিনজনে। সিঁড়ির ধারে প্রেমাঞ্জন। বলল, একটু কথা আছে অমিয়বাবু।

গলা রীতিমত গম্ভীর। স্টার-আর্টিস্টের উষ্মায়, কর্তামশায় হলে, গলা শুকিয়ে জলতেষ্টা পেয়ে যেত। অমিয়শঙ্কর মনে মনে মজা পায়। বলুন না—বলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিনোদকে বলে, যেতে লাগুন আপনারা। হাবুল চা নিয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনে আসি।

প্রেমাঞ্জন বলল, নাটক নিয়ে কিছু বিবেচনার আছে—

অমিয় অবাক হয়ে বলে, ফুল-রিহার্সাল হয়ে গেল, রিলিজের পোস্টার পড়ে গেছে—বিবেচনা এখনও? পাঁচ-দশ নাইট হয়ে যাক, জরুরি যদি কিছু বেরোয় তখন দেখা যাবে।

অমিয় উড়িয়ে দিল, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর ছাড়ে না। বলল, দ্বিতীয় অঙ্কের ঐখানটা পাগলী ভিখারিণী এসে রসভঙ্গ ঘটিয়েছে। জিনিসটা অবান্তরও বটে।

অমিয় কিছু উষ্ণ হয়ে বলে, আমি তা মনে করি না। লোকের হেনো-কষ্ট তেনো-কষ্ট, মুখের কথাতেই কেবল শুনছিলাম—আমি একটা চাক্ষুষ নমুনা দেখালাম, দর্শক-মনের পরতে-পরতে যাতে ছাপ পড়ে যায়।

সেই পাঠটুকুর জন্য জয়ন্তী মিত্তিরের মতন মেয়ে?

অমিয় বলে, ভেবেচিন্তেই দিয়েছি। আনকোরা নতুন মেয়ের প্রথম এই স্টেজে ওঠা—বড় পাঠ হলে গুলিয়ে ফেলতেন। একটা-দুটো কথা বলেই দিব্যি চালিয়ে গেলেন।

হাসল সে। বলে, আপনার নিজের গোড়াটাও ভাবুন প্রেমাঞ্জনবাবু। মামার কাছে শুনেছি। প্রথম তো দু-কথার পাঠ নিয়ে নামেন। এলেম দেখিয়ে তারপরে এত বড় হয়েছেন।

প্রেমাঞ্জন বলে, কিন্তু জয়ন্তী হবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মিড়মিড়ে গলা, এক্সপ্রেশন বলতে নেই। ওদের ক্লাবের থিয়েটারে ভাল পাঠ দিয়ে প্রাণপাত করে শেখালাম, ভস্মে ঘি-ঢালা হয়েছিল। মগজে কিছু নেই, দেহে রূপযৌবন অফুরন্ত। রাজকন্যা সাজলে

চেহারায় অন্তত মানাত, পাগলা ভিখারিণী কি ভেবে সাজালেন আপনিই জানেন।

অমিয় বলে, হ্যাঁ, ভিখারিণী কুরূপ-কুৎসিত হলেও চলত। তা বলে রূপসী ভিখারিণীকেও অডিটেরিয়াম খ্যাক-থু করবে না—উপরি-পাওনা হিসাবে লুফে নেবে, দেখবেন।

প্রেমাঞ্জনও জোর দিয়ে বলে, নেবে তো বটেই। একফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়ে রূপযৌবন উল্টেপাল্টে দেখালেন—তারপরেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

তিক্ত কণ্ঠে অমিয় বলে, ছেঁড়া ন্যাকড়া না পরে কি করবে—এই তো স্বাভাবিক। ভিখারিণীকে বেনারসিতে কে মুড়ে দিতে যাবে বলুন।

নিজের ঘরে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। রাগে তখনও গরগর করছে। বিনোদ শুধায়ঃ কি বলে প্রেমাঞ্জন?

অমিয়শঙ্কর বলে, নটাধিরাজের সিংহাসন টলোমলো। ক্ষেপে গিয়ে অযাচিত টিপ্পনী ছাড়লেন কতকগুলো। হয়েছে কি এখনো—সবে তো সন্ধ্যেবেলা।

কলির-সন্ধ্যে বলো। বেশি স্পষ্ট হবে।

অমিয় বলছে, গণতন্ত্রের যুগ। মুখের উপর কেউ একজন যে ছড়ি ঘোরাবেন, যে দিনকাল চলে যাচ্ছে। এর পরে এমনি করে তুলব, প্রেমাঞ্জন চেয়ারে বসে মন্দারের পাঠ করল, সূর্যমণি টুলে-বসা তার খানসামা—পরের অভিনয়ে বদলা-বদলি, সূর্যমণি চেয়ারে বসেছে, প্রেমাঞ্জন টুলের উপর। না পোষায় তো পথ দেখ। সবাই এক-সমান। পোস্টারে বিজ্ঞাপনে কোন আর্টিস্টের নাম থাকবে না—

থাকবে কেবল নীলনৃত্যের রাকা বর্মণ, বস্ত্রহীন ভিখারিণী জয়ন্তী মিত্তির—। অমিয়র সঙ্গে এক সুরে বিনোদ জুড়ে যাচ্ছেঃ আর থাকবে আলোর খেলোয়াড় চন্দ্রমোহন, ম্যাজিক-মাস্টার ভানু সরকার—

হাবুল চা এনে ফেলল। সঙ্গে রেস্তোরাঁর ছোঁড়া, একটা নয়—একজনে পেরে ওঠেনি, দু-জন। ক্ষিধে পেয়ে গেছে সত্যি। খেতে খেতে অমিয় সগর্বে শুধায়: চলবে না—বিনু-দা, কি বলো?

বিনোদ বলে, চলবে না কি গো—ছুটে চলবে। রাজধানী-এক্সপ্রেসকে হার মানাবে। কায়দাটা সকলের আগে তোমারই মাথায় এলো। পাইওনিয়র তুমি—মঞ্চের উপর এ জিনিসের প্রথম আমদানি তোমার। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তোমার নাম কেউ বাদ দিতে পারবেন না। শহরে মফঃস্বলে যত থিয়েটার আছে, তোমার দেখাদেখি হুড়মুড় করে সকলে এই সহজ পথে এসে পড়বে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যাত্রাপার্টিরাও বাদ থাকবেন না।

পুলকে গদগদ হয়ে অমিয় বলে, আপনি এই কথা বলছেন বিনু-দা—এই লাইনের বিশেষজ্ঞ আপনি একজন।

বিনোদ বলে যাচ্ছে, বিস্তর বাগানবাড়ি ছিল কলকাতার আশেপাশে—শনি-রবিতে সেখানে স্ফূর্তির বান ডাকত। এখন লোপাট, উদ্বাস্তুরা দখল করে বাগানবাড়িতে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মানুষ তো সে-ই আছে—ক্ষিধেও আছে ঠিক। তোমার থিয়েটার বাগানবাড়ির অভাব ঘোচাল। সেই হররা—শহরের একেবারে মাঝখানে বসেই। এ জিনিস পড়তে পারে না। আরো এক ব্যবস্থা করো দিকি এইসঙ্গে।

কি? কি? আগ্রহে অমিয় তাকিয়ে পড়ল।

বার খুলে দাও বুকিং-অফিসের পাশটিতে। দুর্দান্ত চলবে।

অমিয় উড়িয়ে দেয়: হ্যাঃ, লাইসেন্স যত্রতত্র দিল আর কি!

বিনোদ নিরীহ কণ্ঠে বলে, আরে ভায়া, যে অষুধের যে রকম অনুপান। এটার দিচ্ছে তো ওটারই বা কেন দেবে না? কত লাভ সেটাও তো ভেবে দেখবে কর্তারা! পেটের ক্ষিধে চেপে প্রজাবর্গ এইসবে মসগুল হয়ে থাকবে, 'মিছিল-নগরী' একেবারে মৃতবৎ শীতল—রূপকথার সেই রাক্ষসে-খাওয়া পুরীর মতন।

বুঝেছে অমিয় বিনোদের রঙ্গরসিকতা—উঁকিঝুঁকিতে যে ধারায় সে লিখে থাকে। বলল, এ ছাড়া উপায় ছিল না বিনু-দা। আমাদের খবর আপনি না জানেন কোনটা। দেনা বাড়তে বাড়তে বাড়তে দেড় লক্ষ টাকার মতো—সবটা আমি ঘাড় পেতে নিলাম। তার পরেই মামা আমার উপর সমস্ত ভার দিলেন। দিয়েছেন বলেই মণিমঞ্চ বাঁচল।

বিনোদ ঘাড় নাড়ে: উঁহু, মঞ্চ মরল। তোমরা বাঁচলে। দোষ কি, চাচা আপনা বাঁচা—এ-যুগের এই নিয়ম। টাকা কিসে ঘরে আসে, তারই ভাবনা। তোমার দাদামশায় কি মামার মতন আজেবাজে দশরকম ভাবতে গেলে ব্যবসা হয় না।

অমিয় বলল, নিজের হাতে হ্যাণ্ডবিল একটা ছকে ফেলেছি বিনু-দা। আপনি আছেন, হেমন্তবাবু আছেন—আপনারা একবার করে চোখ বুলিয়ে দিন:

বড় বড় অক্ষরে লেখা কাগজখানা টেবিলে এদের সামনে রাখল:

॥ নবীন নাট্যকার হেমন্ত করের যুগান্তকারী নাট্য-নিবেদন ॥

উর্বশীর হাসি

(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

পরম উপভোগ্য বিস্ময়কর প্রমোদনাট্য। হাসির হুল্লোড়। জীবনের সর্বসমস্যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পুরো তিনটি ঘণ্টা প্রমোদ-তরঙ্গে ভাসুন। ক্যাবারে-রানী মিস রাকা বর্মণের লাস্যনৃত্য। স্টেজের উপরেই বন্যাস্রোতে রেললাইন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হুড়মুড় করে পুল ভেঙে পড়ছে···

হাবুলও ঘাড় লম্বা করে উঁকি দিচ্ছে। বলল, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য—ওটা আবার কেন নতুনবাবু? ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও বিস্তর আসে থিয়েটার দেখতে।

বিনোদ বলে, সেইজন্যেই আরো বেশি দরকার হ্যাবুল। হ্যাণ্ডবিল দেখে এরপর নার্সারীর বেবিগুলো পর্যন্ত টিকিট কিনতে লাইন দেবে। বয়স পরীক্ষার জন্য লাঠিসোঁটা নিয়ে কেউ তো গেটে থাকে না। তবে একটা লাইন জুড়ে দিতে পারো নতুনবাবু। চুম্বকে সব বলা হয়ে যাবে—

সাগ্রহে অমিয় বলে, বলুন—বলুন—

একই মঞ্চে একসঙ্গে থিয়েটার ম্যাজিক অ্যাক্রোবেটিকস—

হেমন্ত জুড়ে দেয়ঃ এবং উদ্যান-বাটিকা। আসলটাই বাদ দিও না বিনু-দা।

বলে কলমটা নিয়ে হ্যাণ্ডবিল থেকে নিজের নাম কেটে অমিয়শঙ্কর বসিয়ে দিল: নবীন নাট্যকার অমিয়শঙ্করের যুগান্তকারী নাট্যনিবেদন উর্বশীর হাসি—

অমিয় সবিস্ময়ে বলে, এটা কি করলেন ?

হেমন্ত বলে, কীর্তি তো আপনারই, আপনার প্রাপ্য যশ আমি কেন নেবো ?

পরিচালক আছেই, তার উপর নাট্যকার হতে যাচ্ছে—অমিয়শঙ্কর মনে মনে নিশ্চয় খুশি। তবু বলতে হয় তাই বলল, মূল-নাটক তো আপনারই। দরকারে কিছু জোড়াতালি পড়েছে।

হেমন্ত হেসে বলল, তালি পড়তে পড়তে তালিয়ানাই হয়ে গেছে। মূল-সামিয়ানার ইঞ্চিখানেকও আর বজায় নেই। এ জিনিস আপনার।

কী মানুষ আপনি! নাম বাদ পড়লে কষ্ট হবে না ?

থাকলেই বরঞ্চ খচ-খচ করে কাঁটার মতো বিঁধবে।—হঠাৎ হেমন্ত জোড়হাত করে সকাতরে বলল, আমায় অব্যাহতি দিন নতুনবাবু।

অমিয় বলল, বেশ, নামে যখন এত আপত্তি—বিশেষ ইস্কুলের শিক্ষক আপনি—আপনার ক্ষতির কারণ হতে চাইনে। নাট্যকার

আমিই হলাম, তবে প্রতিটি অভিনয়ের রয়্যালটি পঁচিশ টাকা হিসাবে বরাবর আপনিই নিয়ে যাবেন।

রাত অনেক। উঠতে যাচ্ছে। কিন্তু চরম হতে বাকি ছিল একটু।

সহসা সত্যসুন্দরের আবির্ভাব : ভেবে দেখলাম অমিয়, মণিমঞ্চ নামটা তুমি যদি বাদ দিয়ে দাও।

কেন মামা, থিয়েটারের নাম বদলানোর কি হল ?

সত্যসুন্দর বলেন, বাবার নাম জড়িয়ে মণিমঞ্চ হয়েছে। মঞ্চ নিয়ে তিনি জীবনপাত করে গেছেন, মঞ্চকে তিনি মন্দির ভাবতেন। ঐ নাম রয়ে গেলে স্বর্গ থেকে বাবা অভিশাপ দেবেন।

কাঁপছেন তিনি, কণ্ঠস্বরে যেন কান্না। বললেন, বাড়ি যাচ্ছি। থিয়েটারে আর আসব না। এই কিন্তু আমার শেষ কথা। আদেশই বলতে পার।

বলে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

স্তম্ভিত এরা, চার জনেই। সামলে নিয়ে ক্ষণপরে অমিয় বলে, একালের মানুষ টিকিট কেটে মন্দিরে ঢুকতে আসে না। ওঁরা এখনো সেকালের মধ্যে ঘুরছেন। মন্দির করে করেই তো এমন চালু ব্যবসা ডকে ওঠার গতিক। এতখানি এগিয়ে এত খরচখরচার পর এখন আর পেছনো সম্ভব নয়। যা বলে গেলেন, হোক তবে তাই। থিয়েটারের নাম-বদল—কি নাম দেওয়া যায়, বলুন তো একটা বিনু-দা।

বিনোদের হাজির-জবাব : বিবসনা—

তাই হয় বুঝি—ধুস !—হাসে অমিয়শঙ্কর।

ও, শক্ত কথা হয়ে গেল—সকলে বুঝবে না। তবে উলঙ্গিনী করো—উলঙ্গিনী থিয়েটার।

ঠাট্টা নয় বিনু-দা। বলুন—

বিনোদ বলে, যেটা তোমার আসল পুঁজি, যা ভাঙিয়ে রোজগার, সরাসরি বলে দেওয়াই তো ভাল। খদ্দেরে বেশি ঝুঁকবে।

অমিয়শঙ্কর বলে, রাকা কিন্তু একেবারে বিবসনা হয় না—আপনাদের দৃষ্টিভ্রম। ডবল বিকিনি পরে আসে। উপরের মোটা বুননের বিকিনি খুলে দেয়, তলায় অতি-মিহি আর একটা, হুবহু দেহচর্মের রং, সেইটে থেকে যায়। একেবারে সেঁটে থাকে, আপনারা ধরতে পারেন না। বেয়াড়া আইন—আব্রু একটুকু চাই-ই। থিয়েটারের নামের বেলাও তাই—আব্রু রাখতে হবে। আচ্ছা, 'অপ্সরা' হলে কেমন হয়? হরে-দরে একই হল। অপ্সরাদেরও কোমরে শাড়ি থাকে না বলে জানি। নামের মধ্যে থলথলে কবিত্ব, শুনতেও খাসা। রসিক সুজন ভিতরের বক্তব্য বুঝে নেবে। লাগসই নাম—তাই না? মণিমঞ্চের চেয়ে ঢের ঢের ভাল—থিয়েটার অপ্সরা।

শেষ